রূপসী বাংলার মুখ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

BENGALI EBOOK
2021

সূচিপত্র

আতসী.....2
দীপ জ্বেলে যাই.....57
বারমুডা লিলি.....69
রূপসী বাংলার মুখ.....99

অতসী

অতসী একটি ফুলের নাম। স্বর্ণাভ। দেখতেও মিষ্টি।

অতসী গাঙ্গুলির বন্ধুরা এই ফুলের সঙ্গে নামের মালিকের তেমন মিষ্টি গোছের। মিল দেখতে পায়। বন্ধু বলতে য়ুনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েরা। এই মিলটা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বা ধরিয়ে দিয়েছে অতসী গাঙ্গুলির ছেলেবেলার বন্ধু শোভনা বিশ্বাস। সে-ও তারই সঙ্গে কলেজ ডিঙিয়ে ইকনমিক্স পড়তে ঢুকেছে। এই মিল দেখানোর পিছনে একটু বাস্তব রসের যোগ আছে।...যে কলেজ থেকে তারা পাশ করে বেরিয়ে এসেছে, সেখানকার দুজন তরুণ শিক্ষক ওই ফুলের সঙ্গে এই মিল। আর মিতালিটুকু প্রথম আবিষ্কার করেছিল। তাদের একজন সেটুকু সামনা-সামনি ঘোষণা করার মতো সাহস দেখিয়েছিল। অতসী গাঙ্গুলি খুব খুশি হয়ে তাকে চপ কাটলেট খাইয়ে বিদায় করেছিল। তারপর ওই মন-পসন্দ নামের মালিকের কাছ থেকে আশানুকুল সাড়া না পেয়ে ভদ্রলোক আর একদিন বাড়িতেও এসেছিল। দূর থেকে অতসীকে সে দোতলার ঘরের জানলার কাছে কয়েক পলকের জন্য দেখেও ছিল। আর অতসীও তাকে দেখেই সরে এসেছিল।

বাড়ির কাজের লোকটি এসে খবর দিতেই অতসীর সাফ জবাব, বলে দাও বাড়ি নেই, কখন ফিরব তারও ঠিক নেই।

এই অতসী-স্তুতি সেখানেই শেষ। শুনে শোভনা বিশ্বাস বলেছিল, এত অকরুণ। হতে পারলি কি করে–গোলাপে কাটা থাকে জানি, অতসীতেও থাকে।

দ্বিতীয় মিল-আবিষ্কারক ওই কলেজের বাংলার তরুণ কবি-শিক্ষক। উঠতি কবি হিসেবে ভদ্রলোকের বেশ সুনাম তখন। অতসী নামের মূল তার হৃদয়ে গেঁথে আছে দুবছর ধরে ক্লাস করেও সেটা বোঝা যায়নি। এম, এ ক্লাসে ভর্তি হবার পর ডাকে একদিন অতসী গাঙ্গুলির নামে আধুনিক কবিতার মাসিক-পত্র এলো। কে পাঠালো ভেবে না পেয়ে পাতা উল্টেই দেখে ছাপা অক্ষরে

প্রথম কবিতার নামই অতসী। নিচে কবির নাম। বলাবাহুল্য কলেজের সেই অতি চেনা নাম।

বার কয়েক মনোযোগ নিয়ে পড়ে কবিতার মর্মোদ্ধার করা গেছে। চৌ লাইনের মধ্যে পুষ্পবাহার অতসীর বিশেষ একটি মানবী রূপের কল্পনা এবং স্তুতি।

যা করণীয় অতসীর তা ঝটপট করে ফেলা অভ্যাস। তারপর চার লাইনের একটা চিঠির নকলসহ কবিতাটা শেভনাকে দেখিয়েছে। প্রথমে কবিতা এবং পরে চিঠিটা পড়ে শোভনার দুচোখ কপালে।–এই চিঠি সত্যি তুই ভদ্রলোককে পাঠাবি নাকি?

–পাঠাবো না, পাঠিয়ে দিয়েছি।

রুদ্ধশ্বাসে শোভনা চিঠিটা আবার পড়েছে।

কবিতা-পত্র পেলাম। ধন্যবাদ। আপনার অতসী পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। পরের সংখ্যায় কৌটিল্য-ব্যঞ্জনাসহ অর্থশাস্ত্রের ওপর একটি নিটোল সনেট দেখতে পেলে আরো মগ্ধ হব।

–চিঠিতে তোর নাম দিসনি? শোভনার ব্যগ্র প্রশ্ন।

–দেব কেন, কবিতার ওই মাসিক-পত্র যে পাঠিয়েছে সে তার নাম দিয়েছে?

দুজনেই ইকনমিক্স-এর ছাত্রী, অবশ্য বি-এর রেজাল্ট দেখলে শোভনার থেকে অতসী ঢের বেশি এগিয়ে। সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়েছিল। আত্মীয় পরিজনেরা তাইতেই বেশ খুশি। কেবল অতসীর বুকের ভিতরটা চিনচিন জ্বলছে। মার্কশীটে দেখা গেছে ফার্স্ট ক্লাস ফাস্ট-এর থেকে আট নম্বর মাত্র পিছিয়ে। তার মধ্যে দুদুজন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, তারা ছেলে। একজন সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে, সে মেয়ে। অতসী ওদের থেকে নিজেকে কোনো অংশে খাটো ভাবে না। কিন্তু দুদুটো টিউশনি চালিয়ে এর বেশি আর কত হবে। এম. এ-তে ওই তিনজনকেই মনে মনে দেখে নেবার ইচ্ছে। কিন্তু ভিতরের এই জ্বলুনি বা অভিলাষ কাউকেই বুঝতে দেবার মেয়ে নয় সে।

www.bengaliebook.com

.

যাক। এবারে বন্ধুর উৎসুক প্রশ্ন, কৌটিল্য-ব্যঞ্জনা সহ অর্থশাস্ত্রের ওপর একটি নিটোল সনেট দেখা আর মুগ্ধ হওয়ার অর্থ কি–কলেজের বাংলা মাস্টারের আর্থিক সংগতির খোঁচা দিলি?

অতসীর হাসি এবং জবাব, যা খুশি বুঝে নে বাপু, মনে এলো লিখে দিলাম।

সাদা-মাটা দেখতে শোভনা বিশ্বাস অরসিক বা অনুদার নয়। য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকে প্রশংসার ছলে দুই একটি উৎসুক ছেলের কানে অতসী-নামের মহিমা আর মাধুর্য তুলে দিতেই সেটা দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। দুদুটি তরুণ মাস্টারের মুখে ঝামা ঘষে দেবার ঘটনা শোভনা বিশ্বাস অবশ্যই অনুক্ত রেখেছে। সেটা বলা মানেই প্রকারান্তরে তাদের সতর্ক করা আর সমঝে দেওয়া। এই বোকামো করলে ভবিষ্যতের মজার আশায় জলাঞ্জলি। কলেজের কবি-শিক্ষকের লেখা পুষ্পবাহার অতসীর বর্ণনা আর উপমা কটা কেবল সানুরাগে বন্ধুর ওপর চালিয়ে দিয়ে মন্তব্য করেছে, নামের সঙ্গে এমন মিষ্টি মিল কমই দেখা যায়।

অতসী-ফুল বা গাছ কত ছেলে দেখেছে আর দেখলেও কত জনে মনে রেখেছে। তাতে দুই বন্ধুরই সন্দেহ আছে। দুজনেরই ধারণা এই মিলটুকু ধরিয়ে দেবার পর ছেলেগুলোর কেউ-কেউ আলিপুরের হর্টিকালচারাল গার্ডেনে হানা দিয়েছে। তা না হলে ওই ফুলের গুণগান ছেলে-মেয়েদের (বিশেষ করে ছেলেদের) মুখে মুখে এতটা প্রগলভ হয়ে ওঠে কি করে? ফুলের গুণ-গান বলতে নামের মিলের প্রশস্তি।

এই প্রশস্তির ধারে কাছে না ঘেঁষেও ওই নামের ওপর ছোট্ট একটু কটাক্ষপাত করে ছাত্রবন্ধুদের মজার খোরাক যুগিয়েছিল যে ছেলে তাকে য়ুনিভার্সিটির মধ্যমণি। বললেও অত্যুক্তি হবে না। সমর ঘোষাল। কিন্তু এ প্রসঙ্গ একটু পরে। ছেলেরা সমর ঘোষালকে কেবল ভালবাসে না, অনেক উঁচু পর্যায়ের আত্মজন ভাবে। অতসীর থেকে বছর খানেকের বড় হবে, পড়েও এক ক্লাস ওপরে। সিক্সথ ইয়ারের ছাত্র, সাবজেক্ট ইংরেজি। গত

তিন বছরের মধ্যে তার আগে বি, এ-তে ওই বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স কেউ পায়নি। সমর ঘোষাল বেশ দাপটের সঙ্গে এই কলঙ্ক মোচন করেছে। এম. এ-তেও ফাস্ট ক্লাস পাবে, এ-ও যেন ধরা-বাঁধা ব্যাপার। ভালো ক্রিকেটার, নামা ক্লাবের এডিভিশনে খেলে, গত বছর থেকে বাংলা দলের বাছাই বারো জনের মধ্যেও জায়গা করে নিতে পেরেছে। মুরুব্বি জনেরা উৎসাহ দেয়, লেগে থেকে সেভাবে চেষ্টা করলে ভারতীয় বাছাই দলেরও সে নিশ্চয় একজন হতে পারবে। এমনিতে চোখের আড়ালেই সরে থাকতে চায়, কিন্তু টেনে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে অন্য মানুষ। ইংরেজি বাংলা দুই-ই কান পেতে শোনার মতোই বলে। ছাত্র মহলের ইউনিয়নবাজী তথা রেষারেষি অনেকটা এই একজনের জন্যেই অনেক শান্ত এখন। মধ্যস্থতায় নামলে মিটমাট হয়ই। এ হেন গুণের ছেলের সব থেকে বড় গুণ কথা-বার্তায় চাল-চলনে এতটুকু দম্ভ নেই। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, ঠিক সেই রকমই থাকে। যে-যা বলুক মন দিয়ে শোনে, যেন সকলের কাছ থেকেই তার কিছু শেখার আছে। এমনি সব কিছুর ভিতর দিয়ে তার শান্ত সহজ ব্যক্তিত্বটুকুই সকলকে আকর্ষণ করে।

শোভনা বিশ্বাসের একটা বড় দোষ বা বড় গুণ, সে সক্কলের সঙ্গে যেচে আলাপ করতে ওস্তাদ। কোনো নামী ছেলে বা মেয়ের কথা শুনলে কতক্ষণে তাকে একটু নাড়াচাড়া করে দেখবে সেই ফাঁক খোঁজে। কলেজে পড়তে সায়েন্স গ্রুপ পড়াতেন এক প্রৌঢ় নাম-করা প্রফেসার। তার ছাত্ররা তাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত। কথায় কথায় শোভনা কার মুখে শুনল ভদ্রলোক ম্যাট্রিক থেকে এম. এস-সি পর্যন্ত ফার্স্ট ছাড়া কখনও সেকেন্ড হননি। কলেজ আঙিনায় ভদ্রলোককে সামনা-সামনি দেখেই এগিয়ে গিয়ে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম সেরে মুখোমুখি দাঁড়ালো।–আপনার হাতখানা একবার আমার মাথায় রাখুন তো সার।

ভদ্রলোক অপ্রস্তুত।-কেন বলো তো, তুমি কী পড়ো–কোন ইয়ারের ছাত্রী?

-বলছি! বিনীত নিবেদন, আগে আপনার হাতখানা একবার আমার মাথায় রাখুন না…।

কি আর করেন? রাখলেন।

-আমি বি, এ ফাইনাল ইয়ারের ইকনমিক্স-এর খুব সাধারণ ছাত্রী…ম্যাট্রিক থেকে এম. এস-সি পর্যন্ত একজন ফাস্ট হওয়া মানুষ জীবনে এই প্রথম দেখলাম সার, দোষ নেবেন না।

অতসী একটু পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছিল আর শুনছিল। কলেজ গেট পেরিয়ে হাসতে হাসতে বলল, হায়ার সেকেন্ডারি থেকে এম. এ, এম-এসসি পর্যন্ত ফাস্ট আজকাল অনেকেই হয়, এই ভদ্রলোকের অর্ধেক বয়সের সে-রকম কাউকে যদি সামনে দেখতিস?

-তাহলে মাথায় হাত রাখতে বলতে পারতাম না, আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে একবার জড়িয়ে উড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করত, ফার্স্ট বা ফার্স্ট ক্লাস ছেড়ে মোটামুটি সেকেন্ড ক্লাস যদি একটা হয়।

সেদিন লাইব্রেরি হলে দূরের টেবিলে একজনকে দেখা গেল। বিকেলে ওই টেবিলে তাকে প্রায়ই দেখা যায়। অতসীকে ক্লাসের পর নিয়মিত লাইব্রেরিতে এসে পড়াশুনা সেরে নিতে হয়। ফিরে গিয়ে দুদুটো টিউশনি আছে, সপ্তাহে তিন দিন করে পড়ায়, বাড়ি গেলে নিজের পড়ার সময় মেলে না। তাছাড়া বেশ অবস্থাপন্নর পক্ষেও এম. এ ক্লাসের সব বই কিনে পড়া সম্ভব হয় না, অতসীর তো নিজস্ব খুব কম বই-ই আছে। ছুটির দিনে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়তে যায়। সেখানেও ওই ছেলেকে এক-আধ দিন দেখেছে। সামনা-সামনি পড়ে গেলে বা চোখাচোখি হয়ে গেলে পরিচিতের মতোই সামান্য হেসে পাশ কাটিয়েছে। অতসীও তাই করেছে। য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে আজ ওই দূরের টেবিলে মুখোমুখি একজন মাত্র সহপাঠী বসে। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে টুকটাক কথা-বার্তা চলছে।

আঙুল তুলে অতসী ওই টেবিলটা দেখিয়ে বলল, ওই দ্যাখ, ম্যাট্রিক থেকে এম এতে ফার্স্ট না হলেও এখানকার একটি অলরাউন্ড রত্ন বিশেষ–তোর জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করার মতোই একজন সমর ঘোষাল।

শোভনা বেশ নিবিষ্ট চোখে দেখে নিল। দূরে হলেও এই দিকে মুখ করেই বসেছে। অস্‌ফুট মন্তব্য করল, আমার নয়, মনে হচ্ছে তোর ইচ্ছে করার মতোই একজন। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো–চলি…। হাত

-ওকি! এই শোন–

কর্ণপাত না করে এগিয়ে চলল। সোজা ওই টেবিলে। দুদিকের দুজনেই এক সঙ্গে মুখ তুলল। শোভনা সহপাঠীর দিকে তাকালোও না, সমর ঘোষালকে বলল, আমাদের ওই টেবিলে একবারটি অনুগ্‌রহ করে আসার সময় হবে?

আঙুল তুলে টেবিল দেখালো। সমর ঘোষাল পঞ্চাশ গজ দূরের টেবিলে তাকালো। এবং অতখানি দূর থেকেই অতসী গাঙ্গুলীর সঙ্গে চোখাচোখি।

উঠল। ঠোঁটে মৃদু হাসির আভাস। আসছে। আগে আগে শোভনা। একটা বড় কাজ সমাধা করার মতো মুখ। এই টেবিলে এসে দুই ভুরু সামান্য কুঁচকে একটু ঘটা করেই আর এক দফা রত্নটিকে দেখে নিল। অতসীর মনে হল, যে এলো সে এই দৃষ্টিবাণে আহত বা বিড়ম্বিত হবার মতো একজন নয়।

গম্ভীর মুখে শোভনা বলল, সদ্য কলেজ উৎরানো দুটো কচিকাঁচা আমরা। সেখানে। ছেলে-মেয়ে সক্কলের সঙ্গে সকলের তুই তোকারির সম্পর্ক ছিল, এখানকার হাল কেমন, তুমি চলে না আপনি-আজ্ঞে?

তুমিটাই ভালো চলে।

-বেশ। অতসীর মুখোমুখি চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, ওই চেয়ারে পাঁচটা মিনিট বোসো তাহলে, একটু আলাপ পরিচয় সেরে নিই–

সমর ঘোষাল হুকুম তামিল করল, অর্থাৎ বসল।

–আমি শোভনা বিশ্বাস, খুব সম্ভব সেকেন্ডক্লাস লাস্ট হয়ে ইকনমিক্স পড়তে ঢুকেছি, এ হল…(থেমে গিয়ে একটু ভ্রূকুটির ঘটা) কেন, এর নামের সৌরভ এখনো। তোমার নাকে-কানে পৌঁছয়নি?

কানে পৌঁছেছে, অতসী গাঙ্গুলি, তোমার পাবলিসিটির গুণে ছেলেরা এই নাম নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে, পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম, আমার নাম

–থাক, থাক, য়ুনিভার্সিটির আকাশে তুমি দীপ্ত সূর্য, তোমার আলোর গরিমায় চার দিকের নক্ষত্ররা টিপ টিপ জ্বলছে, এটুকু আমাদের জানা আছে। আমরাও গুণের কদর জানি

আর সেই কারণেই এ হেন গুণীকে জবরদস্তি ধরে আমরা একটু টানাটানি করে থাকি

খোঁটা দেবার সুরে অতসী বলল, আমরা বলে আবার আমাকে জড়াচ্ছিস কেন, নিজের কথা বল

সঙ্গে সঙ্গে শোভনার ভ্রূকুটি এবং ঝাঝ। বেশি দেমাক দেখাস না, তোর মতো চেহারা আর বিদ্যের জোর থাকলে তোকে জড়াতে যাব, এতই বোকা ভাবিস আমাকে?

এবারে সমর ঘোষালের দুচোখ শোভনার দিকেই মনোযোগী একটু। তারপর হাল্কা-গম্ভীর মন্তব্য–নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, তোমার মতো চেহারা আর বিদ্যের জোরের। রসিকতার টানাটানিও ভালো না লাগার মতো উঁচু স্তরের কেউ নই আমি।

খুশিতে বিগলিত ভাব শোভনা বন্ধুর দিকে ফিরে ঠেস দিল, কি রে, শুনলি? খুব যে নাক সিটকোস

চেয়ার ঠেলে সমর ঘোষাল উঠে দাঁড়ালো। ঠোঁটের ফাঁকে একই রকমের মৃদু হাসি, শোভনার দিকে চোখ।–অনুমতি হলে আমি স্বস্থানে ফিরি-এর (অতসীর) ক্ষতি হচ্ছে, পড়াশুনার ব্যাপারে খুব সীরিয়াস এখানেও দেখেছি, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেও লক্ষ্য করেছি।

তেমনি মৃদু হেসে অতসী জবাব দিল, কপাল গুণে আমার গোপাল ঠাকুরের পূজা আর্চা সবই লাইব্রেরিতে…বাড়িতে সময় হয় না।

দাঁড়িয়ে শুনল, দেখলও একটু, কিছু জিগেস না করে ফিরে গেল।

–যা! শোভনার গলায় হতাশা, ভেবেছিলাম যত জমাটি মগজই হোক, আগুনের আঁচে এনে ফেলতে পারলে একটু গলগলা ভাব দেখব, কিছুই তো দেখা গেল না!

–আর জ্বালাসনে বাপু, পড়তে হয় পড়। নয়তো পালা, এ চ্যাপ্টারটা আজ শেষ করতেই হবে।

শোভনার অত ধৈর্য নেই, তাছাড়া বাড়ির গাড়ি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। উঠে পড়ে বলল, এখন চ্যাপ্টারের চাপে বসে বসে চ্যাপ্টা হ, তারপর ট্রাম-বাসের। ভিড়ে চ্যাপ্টা হওয়া আছেই–আমি বাপু সত্যি আর বসে থাকতে পারছি না।

এর পরেও অতসী আর সমর ঘোষালের দেখাসাক্ষাৎ যেটুকু এই লাইব্রেরিতে বা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। য়ুনিভার্সিটিতে কথাবার্তা বলতে গেলে হয়ই না। মুখোমুখি বা সামনাসামনি পড়ে গেলে সমর ঘোষাল হেসে মাথা নাড়ে। অতসীও একই জবাব দেয়। কথা টুকটাক ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দেখা হলে হয়। ফেরার সময় কিছু পথ হেঁটে দুজনেরই ট্রাম বা বাস ধরতে হয়। তারপর দুজনের পথ দুদিকে। সমর ঘোষাল থাকে, মধ্য কলকাতায়, অতসী দক্ষিণে। অতসী প্রায় প্রত্যেক ছুটির দিনেই ন্যাশনাল লাইব্রেরি আসে, সমর ঘোষাল মাঝেমধ্যে। এইটুকু দেখাসাক্ষাৎ বা কথা-বার্তার ফাঁকে বাড়তি আগ্রহের ছিটেফোঁটাও কেউ দেখেনি। দশ মিনিটের হাঁটা। পথ ট্রাম-বাস পর্যন্ত পাশাপাশি আসার মধ্যেও সহজ ব্যক্তিত্বের ফারাক একটু থেকেই যায়। অতসীর এটুকুই খুব পছন্দ। গরীব ঘরের সুরূপা মেয়ে এযাবত পুরুষের হ্যাংলামো অনেক দেখেছে।

তবে ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে ফেরার সময় এটুকু পথ এক সঙ্গে আসে দুজনে। সমর ঘোষালের আগে হয়ে গেলে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, হাসিমুখে জিগেস করে, কত দেরি? অতসীর প্রায়শঃ একই জবাব, আর দুমিনিট অপেক্ষা করো। বা, আর পাঁচ মিনিট। আবার ওর আগে হয়ে গেলে

ঝোলা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে হাসি-হাসি মুখে তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায় কেবল, কিছুই জিগেস করে না। সমর ঘোষাল চটপট উঠে পড়ে। স্বাভাবিক সৌজন্যে আগে ওকে ট্রামে তুলে দিয়ে (চাপাচাপির ভয়ে অতসী পারতপক্ষে বাসে ওঠে না) নিজের ট্রাম বা বাস ধরে।

এটুকুর মধ্যে দুই একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের টুকটাক কথাও হয়। এর মধ্যে সমর ঘোষাল একদিন জিগেস করেছিল, আচ্ছা, তোমার সব পড়াশুনা লাইব্রেরিতে, বাড়িতে একদম সময় পাও না বলেছিলে…কেন, অন্য কিছু শেখটেখ নাকি?

অতসী হেসেই জবাব দিয়েছিল, শিখি না, শেখাই। সপ্তাহে তিন দিন করে সন্ধ্যার পর দুটো মাড়োয়ারি বাড়িতে টিউশনি করি। তারা লোক ভালো, কেবল কামাই পছন্দ করে না। রাত্রিতে তারপরেও নোট-টোট বা লেখা-টেখা নিয়ে বসি-ফলে ঘুমোতে দেরি, সকালে উঠতেও দেরি–আর তার ফলে স্নান-টান সেরে নাকে-মুখে কিছু গুঁজে যুনিভার্সিটিতে ছোটার তাড়া–কম করে এক ঘণ্টার পথ তো।

শোনার পর একটু শ্রদ্ধার ভাবই লক্ষ্য করেছে অতসী। চেহারা বা ছিমছাম বেশ বাস দেখে গরীব ঘরের মেয়ে কেউ ভাবে না। চলতে চলতেই সমর ঘোষাল মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়েছে।–দুদুটো টিউশনি কত দিন ধরে করছ?

–বি, এ পড়তে ঢোকার সময় থেকেই।

পরের বিস্ময়টুকুও নির্ভেজাল মনে হয়েছে অতসীর।–এই করে বি. এ-তে ইকনমিক্স-এর মতো সাবজেক্ট নিয়ে সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড–দারুণ তো!

শুনে মনে মনে সত্যিই খুশি অতসী, কারণ সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ডের খবরটা ও নিজে কখনো দেয়নি। মুখ টিপে হেসে বলল, তোমার ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার থেকেও কঠিন মনে হচ্ছে?

হেসে উঠল, ও একটা হয়ে গেছে…এবারে যে কি হবে ভাবতে গেলে ভয়। করে বলে ভাবি না।

এমন শুনলে উৎসুক হবারই কথা।-কেন?

-আর বলো কেন, আমার বাইরেটাও খেলার মাঠ, বাড়িতেও খেলার মাঠ…গেল বার বেঙ্গল টিমে চান্স পেয়ে কি যে ক্ষতি হয়ে গেল সে-কেবল আমিই বুঝছি।

খেলার সমঝদার অতসী আদৌ নয়। তবু মুখে বলল, নামী খেলোয়াড় হওয়াও কম কথা নয়।

আবার হাসি। আমার দৌড় আমি তো জানি। হাজার খেলি, কোনদিন গাভাসকার বা কপিলদেব হতে পারব না। এর থেকে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়াটা অনেক সহজ ছিল, কিন্তু বাড়িতে খেলার মাঠের শুভার্থীদের হামলায় দুদিকই ফসকাবার দাখিল। সব নয়, এর মধ্যে একটা কথাই কুট করে কানে লাগল অতসীর।…খুব অনায়াসে বলতে পারল, এর থেকে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া অনেক সহজ ছিল। তা-ও এম, এ-তে আর ইংরেজি সাবজেক্ট নিয়ে। অতসীরও আত্মবিশ্বাস সব থেকে বড় পুঁজি। সে-ও অনেক সময়। ভেবেছে, ওই দুদুটো টিউশনি করতে না হলে সে-ও ইকনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস পেতে পারত।..সবে ফিফথ ইয়ার, ফাইনালের এখনো ঢের দেরি, এখনো অতসীকে যদি কেউ টিউশনি থেকে অব্যাহতি দেয়, সে কখনও এমন অনায়াস জোরের সঙ্গে বলতে পারবে না, এবারে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়াটা সহজ ব্যাপার।…ইকনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস ফি বছর একজন ছেড়ে দুতিন জনও পায়, কিন্তু ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়াটা তার বিবেচনায় ভাগ্যের শিকে ছেঁড়ার ব্যাপার, অনন্য প্রতিভাধরও ওই বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া সহজ বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু যে বলল, সে একবার ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে দেখিয়ে দিয়েই বলল, এটা বৃথা আস্ফালনের পর্যায়ে ফেলার অজুহাত ভাবা যায় না।

.

এবারে অতসী নাম বাহারের প্রসঙ্গে বন্ধুদের কাছে সমর ঘোষালের সেই কটাক্ষপাতের প্রসঙ্গ–যা যুগপৎ আনন্দের সঙ্গে একটু তরল বিস্ময়েরও খোরাক যুগিয়েছিল। সমর ঘোষাল টিপ্পনির সুরে বলেছিল, নামের মধ্যে

তোমরা কেবল নৈসর্গিক রসের বাস্তব রূপ দেখছো, কিন্তু ওই নামের সঙ্গে অদৃশ্য ছোট্ট একটু আকার যোগ করলে কি দাঁড়ায় তা কখনো ভেবেছ?

বলা-মাত্র কেউই বুঝে উঠল না। সমস্বরে প্রশ্ন, তার মানে?

–তার মানে অতসীর অ-এর সঙ্গে ছোট্ট একটু আ-কার জুড়ে দিলে কি দাঁড়ায়?

দুই একজনে তক্ষুণি বলেছে, কেন আতসী!

–ঠিক। তাহলে মানেটা কি দাঁড়ায়?

–ভেবে একজন বলেছে, আতসবাজি শুনেছি, আতসী সেই গোছের কিছু হবে।

-খুব ঠিক। আতসী মানে আগ্নেয়, যার জ্বলে ওঠার জন্য সামান্য একটু তাপই যথেষ্ট।...তা তোমাদের অতসীর সঙ্গে অদৃশ্য একটু আ-কার যুক্ত আছে কিনা ভেবে দেখেছ?

কথাটা স-পল্লবে অতসীর কানে উঠতে সময় লাগেনি। শোভনাই বলেছে। তারপর উৎসুক প্রশ্ন, কি রে, সমর ঘোষালের তোর মেজাজের আঁচ পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটেছে নাকি?

না, অতসীর রাগ একটুও হয়নি, ভিতরে ভিতরে কেবল অবাক হয়েছে। অতসীর অ-এর সঙ্গে একটা আ-কার যুক্ত করলে কি হয়, তা কখনো ভাবেনি। কিন্তু যা হয় সেটা কত বড় সত্য তা ওই ছেলে কি বুঝে এমন টিপ্পনী কেটেছে, না নিছক ঠাট্টার ছলে? রাগ হলে বা আঘাত পেলে অতসীর ভিতরটা কি যে জ্বলে জ্বলে ওঠে, সব ভস্ম করে ফেলার মতো আক্রোশে ফুঁসতে থাকে সেটা ও নিজে ভিন্ন আর কে জানে? এমন হলে যন্না আরো বেশি, কারণ ভিতরে যতই জ্বলুক ফুসুক, বাইরে তার প্রকাশ কম। বাইরেটা সর্বদাই দাহ নিবারক শান্ত ব্যক্তিত্বে ঢাকা। ভিতরে বাইরে অতসী গাঙ্গুলী একজন নয়, প্রায় বিপরীত দুজন।

রাগের বদলে ওই একজনের প্রতি কৌতূহল দ্বিগুণ বেড়েছে। য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে দেখা হলে বা চোখাচোখি হলে মিটিমিটি হেসেছে। তারপর সেদিন এক ফাঁকে জিগ্যেস করেছে, সামনের রোববারে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আসছ?

সমর ঘোষালও কদিন ধরে একটু যেন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছিল।-কেন বলো তো? ৩৪৮

-তোমাকে একটু কমপ্লিমেন্ট দেবার ছিল।

সত্যি অবাক।–কেন, কী করলাম?

কী করেছে মাথায়ও নেই বোঝা গেল। হেসেই জবাব দিল, তেমন কিছু না, দেখা হলে বলব।

লাইব্রেরিতে এসেছে। দুজনে দু জায়গায় বসে পড়াশুনা যেমন হয়–হয়েছে। তবে এইদিনে সমর ঘোষাল বেশ আগেই উঠে এসেছে। দেরি আছে?

অতসী নিজের হাতঘড়ি দেখল। এরই মধ্যে হয়ে গেল?

হয়ে গেল না, কমপ্লিমেন্ট পাওয়ার আশায় আর মন বসছিল না।

অতসীও হাসি মুখেই খাতাপত্র গুছিয়ে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে পড়ল। রাস্তায় নেমেই সমর ঘোষাল তাড়া দিল, কিসের কমপ্লিমেন্ট বলে ফেলো, সবুর সইছে না।

-তুমি খুব লোভী তো?

সমর ঘোষাল একবার থমকে তাকালো। তারপর হেসেই বলল, এমনিতে আমি খুব লোভী ছিলাম না, তবে মানুষের চরিত্র বদলাতে কতক্ষণ।...তা বলো, কমপ্লিমেন্ট কী কারণে?

www.bengaliebook.com

অতসী কটাক্ষে একবার দেখে নিল। আগের মন্তব্য একেবারে তাৎপর্যশূন্য মনে। হল না। বলল, কমপ্লিমেন্ট অতসীর অ-এর সঙ্গে ছোট্ট একটা আ-কার জুড়লে কী দাঁড়ায় ছেলেদের সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে।

শুনে সমর ঘোষাল প্রথমে জোরেই হেসে উঠল। ব্যাপারটা ভুলেই গেছ্ল। হাসি থামাতে দুচোখ আবার পাশের দিকে ঘুরল। কমপ্লিমেন্ট তো দিলে…কিন্তু আসলে রেগে যাওনি তো?

–রেগে যাব কেন, তুমি তো অনেকটাই সত্যের কাছাকাছি গেছ…তবে আমার কেবল কৌতূহল, গেলে কি করে, নাকি এটা কেবল বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে নিছক রঙ্গরসের ব্যাপার?

সমর ঘোষাল মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।–সত্যি জবাব দিলে রেগে যাবে না তো?

-কেউ রেগে যাবে মনে হলেও তুমি সত্যের অপলাপ করো নাকি?

–তাহলে বলি।…তুমি আয়নায় নিজেকে দেখো?

–এ আবার কি কথা, রোজই তো দেখি!

বন্ধুদের যা বলেছি তার ষোল আনাই রঙ্গরসের কথা নয়, তার সঙ্গে তোমাকে নিয়ে আমার কিছু ধারণাও মেশানো ছিল।…তোমার চেহারাপ বা রুচির ছিমছাম বেশবাস চাল-চলন দেখলে কারো মনে হবে না দুদুটো টিউশানি আর নিজের হিম্মতের ওপর নির্ভর করে বি এ ইকনমিক্সে সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়ে এম. এ পড়তে এসেছ। বাসের আ-দেখলে চাপাচাপির ভয়ে তুমি সর্বদা ট্রামে যাতায়াত করো, সংগতি থাকলে ট্রামও এড়াতে। চরিত্রগতভাবে তুমি কেবল অতসী ফুলখানা হয়ে বসে থাকলে এত কষ্ট করে এভাবে এগোতে চেষ্টাই করতে না, অনেক আগেই যাচাই বাছাই করে কারো ঘরের শোভা বর্ধন করতে চলে যেতে। তাই আমার মনে হয়েছে যতই ওরা তোমার মধ্যে ফুলবাহার অতসীর মিষ্টি মিল টেনে বার করুক, দরকার হলে অতসী। থেকে তুমি আতসীও হয়ে উঠতে পারো।

অতসী কান পেতে শুনছিল। বলে উঠল, থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।

.

এরপর অনেক পাঠকের হয়তো প্রত্যাশা আর অনেক পাঠকের হতাশা, কাহিনা এবার চিরাচরিত প্রেমের রাস্তায় গড়াবে। ...হা প্রেমের রাস্তায় এগনো একটু আছেই, তবে সকালের ঘাসের ডগায় মুক্তা-বিন্দুর মতোই স্বল্প পরমায়ু তার।

পড়াশুনার চাপ যথাসম্ভব বাড়িয়েও সমর ঘোষাল এম এতে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি। কেউই পায়নি। সমর ঘোষাল সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে।

রেজাল্ট খুব প্রত্যাশিত হল না বলে অনেকে সহানুভূতি আর সান্ত্বনার কথা বলেছে। কেবল অতসী গাঙ্গুলী এ নিয়ে একটি কথাও বলল না বলে সমর ঘোষাল প্রথমে একটু অবাক হয়েছিল। পরে কিছু না বলাটাই তার ভালো লেগেছে-কথায় চিড়ে ভেজে না এই প্র্যাকটিকাল মেয়ে তা খুব ভালো করেই জানে।

অতসী ভেবেছিল দেখা-সাক্ষাতে এবারে একটু ছেদ পড়বে, আবার মনে মনে বিপরীত আশাও ছিল। বিপরীতটাই হয়েছে। য়ুনিভার্সিটির দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়েছে। তার বদলে প্রত্যেক ছুটির দিনে সমর ঘোষাল ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আসা শুরু করেছে। তার সাবজেক্ট ইংরেজি, বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, এম. এ-তে সেকেন্ড ক্লাস ফাস্ট-বে-সরকারী কলেজে চটপট একটা মাস্টারি জুটিয়ে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধে হয়নি। অতসীকে বলেছে, এটা খুব সাময়িক, এবারে খেলার মাঠ ভুলে সে আই এ এস পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সেই প্রস্তুতির তাগিদেই ছুটির দিনে এখন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আসা। এই উচ্চাশার কথা শুনে অতসী একটা উৎসাহের কথাও বলেনি। এ-টুকুও সমর ঘোষাল লক্ষ্য করেছে, কিন্তু আদৌ অখুশি হয়নি। এই ব্যক্তিত্বের মেয়ের মুখের কথায় নেচে না ওঠারই কথা। অন্য দিকে অতসী জানেও না আই এ এস হওয়ার জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এসে কাজ করার কতটা দরকার।...সীরিয়াস ছেলে, এম, এ-

তে ঘা খেয়েছে, দরকার থাকতেও পারে। কিন্তু এ-ছাড়া এখানে আসার আর কোনো আকর্ষণই নেই এটা সে ভাবেও না, বিশ্বাসও করে না।

দিন গড়িয়েছে। সমর ঘোষালের আই এ এস পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। কারণ পরীক্ষার মাত্র কদিন আগে তার বাবা মারা গেছে। সামনের বারে দেবে বলেছে। অতসী বাবার মৃত্যুর জন্য সহানুভূতি এবং সান্ত্বনার কথা বলেছে। আই এ এস-এ বসা হল না বলে কোনো পরিতাপের কথা বলেনি। এই না বলার মধ্যে তার শান্ত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ পারসোনালিটির দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে সমর ঘোষালের কাছে। বনের পাখির আশায় কথা তারাই বেশি খরচ করে যাদের নিজের ওপর বা অন্যের ওপর আস্থা কম।

ততদিনে অতসীরও এম. এ পরীক্ষা শেষ। যথাসময়ে রেজাল্ট বেরিয়েছে। এবারে সেকেন্ড ক্লাস ফাস্ট। ফার্স্ট ক্লাস তিনজন। শোভনা তাকে কংগ্রাচুলেট করতে বাড়িতে ছুটে এসেছিল। তার এম, এ পরীক্ষা দেওয়াই হয়নি। সিক্সথ ইয়ারে পৌঁছুবার আগেই তার বিয়ে হয়ে গেছল। বড়লোকের মেয়ের রূপের ঘাটতি পূরণ করা কঠিন কিছু নয়। আপাদ-মস্তকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মনে মনে অতসী তাকে খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছে। শীগগিরই ছেলেপুলে হবে বোঝা যায়।

সমর ঘোষালও সেই প্রথম বাড়িতে এসেছে। তার কথায় উচ্ছ্বাস বা আতিশয্য নেই এটুকু ভালো লেগেছে। কিন্তু কথাগুলো খুব পছন্দ হয়নি। বলেছিল, ফার্স্ট ক্লাস পেলে আরো কত যে ভালো লাগত…মনে মনে আশাও করেছিলাম।

শুনে অতসী হেসেছে, কিন্তু ভেতরটা চিনচিন জ্বলেছে।…কারণ, এই লোক এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি বলেই তার নিজের ফার্স্ট ক্লাস পাবার উদ্দীপনাটা দ্বিগুণ। বেড়ে গেছল। খেটেছিল খুব।

এরপর দুমাসের মধ্যে সমর ঘোষালের আর দেখা নেই। কেউ লক্ষ্য করছে না, অতসীর দুই ভুরুর মাঝে একটু কোঁচকানো ভাজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সমর ঘোষালের বাড়িতে টেলিফোন আছে। নম্বরও জানা। বাইরে বেরিয়ে একটা ফোন করলেই হয়। তাতেও ভিতর থেকে বাধা।

www.bengaliebook.com

না করে ভালই করেছে। আরো দিন দুই যেতে নিজেই এসে হাজির। বেলা। তখন এগারোটা বেজে গেছে। অতসীর কেন যেন মনে হল, তার এখানে বসার ঘর বলতে একটাই, এবং সেটা বাবা মা ভাই বোন সক্কলের অধিকারে, আর কারো হানাদারি অভিপ্রেত নয় বলেই অসময়ে আসা। এটা কোনো ছুটির দিন নয়, এক বাবা-মা ভিন্ন আর কারো বাড়িতে থাকার সম্ভাবনাও কম।

বসতে দিয়ে এবং নিজে মুখোমুখি বসে নিরীহ প্রশ্ন করল, এ সময়ে যে...আজ কলেজ ছিল না?

–ছিল, কাল রাতে হঠাৎ ছোট্ট একটা গল্প মনে পড়ে যেতে একটু বাড়তি উৎসাহ নিয়ে কলেজ বাতিল করে তোমার এখানে চলে এলাম।

-তাই নাকি, কি এমন গল্প?

দ্বিধা-ভরে অন্দরের খোলা দরজার দিকে একবার তাকালো।-ইয়ে...কেউ নেই তো?

-তোমার গল্প শোনার জন্য কান পেতে বসে থাকার মতো কেউ নেই।

শুনে বেশ একটু জোরের সঙ্গেই সমর ঘোষাল বলল, তাহলে আজ আর আমাকে ঠেকায় কে? গল্পটা ছোট্ট, সাদা-সাপটা ব্যাপার।...কোনো ছেলের এক মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছে, কিন্তু অনেক পাঁয়তারা কষেও মেয়েকে কথাটা বলে উঠতে পারছে না। শেষে কি বলবে, অনেক গুছিয়ে রিহার্সাল দিয়ে বলবেই পণ করে সেই মেয়ের কাছে। হাজির। কিন্তু এত বারের রিহার্সাল দেওয়া ভালো-ভালো সব কথাগুলোই ভুল হয়ে গেল। ফলে নিজের ওপরেই বিষম রেগে গিয়ে ঠাস-ঠাস করে কেবল তিনটে কথা বলে উঠল, আমি তোমাকে চাই! শুনে মেয়েটি একবার শুধু তাকালো বলল, নিয়ে নাও....ছেলেটা হাঁ। ভাবছে ডারল্ড ইজি! সো ইজি!

দুই ঠোঁট চেপে অতসী হাসছে, চোখেও হাসি উছলে উঠেছে।

এবারে সমর ঘোষাল চেষ্টা করে গম্ভীর।ভাবলাম ঝপ করে বলে ফেলতে পারলে কপাল জোরে আমার কেসটাও তো ডারল্ড ইজি অ্যান্ড সো ইজি হয়ে যেতে পারে। –হাসি নয়, পারে কি পারে না বলো?

দুই ঠোঁটে আর চোখে হাসিটুকু তেমনি আগলে রেখে অতসী মাথা নাড়ল। পারে।

সঙ্গে সঙ্গে সমর ঘোষাল চোখ পাকালো, তাহলে দুদুটো মাস আমাকে যন্নার। মধ্যে না রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ফোন করলেই তো হত– করোনি কেন?

বসার ঢংটা একটু শিথিল করে নিয়ে অতসী বলল, এবার তাহলে আমার একটা ছোট্ট গল্প শোনো..এক ছেলের আর এক মেয়ের ভাব-সাব, দুজনে দুজনকে পছন্দও করে, তাই থেকে মেয়েটার ধারণা ছেলেটাকে তার ষোল আনা জানা হয়ে গেছে। মেয়েটি একদিন প্রস্তাব করল, এবারে আমরা বিয়ে করে ফেললে কেমন হয়। মুখে চিন্তার ছায়া ফেলে ছেলেটা জবাব দিল, হয় তো ভালই কিন্তু কে আর আমাদের বিয়ে করতে এগিয়ে আসছে বলো…। তাই আমি ষোল আনা বোঝার জন্য তোমার গল্পটা আগে শোনার অপেক্ষায় ছিলাম।

এবারে সমর ঘোষাল এত জোরে হেসে উঠল যে নিজের ঘরে বসেও অতসী সচকিত একটু।

-তাহলে চলো উঠে পড়া যাক, এই দিনে ঘরে বসে আর ডাল ভাত-মাছ। ভালো লাগবে না।

স্নান সারাই ছিল, খুশি হয়ে অতসী দশ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে এলো। তার এই অনাড়ম্বর ছিমছাম ভাবটা শুরু থেকেই সমর ঘোষালের পছন্দ। আর কেউ হলে কম করে আধ-ঘণ্টা সময় নিত।

পার্কস্ট্রীটে এসে একটা ভালো রেস্তোরাঁ বেছে নিল। খাওয়ার ফাঁকে টুকটাক ভবিষ্যতের কথা শুরু হল। সমর ঘোষাল প্রস্তাব করল, তাহলে মা-কে বলি, পুরুত ডেকে যত তাড়াতাড়ি হয় দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলুক?

অতসী বলল, পুরুত ডেকে পিঁড়িতে বসে বিয়ে আমার পছন্দ নয়, তার থেকে রেজিষ্ট্রি বিয়ে হোক।

-সে কি! কেন?

অতসী খুব অনায়াসে বলে গেল, কেন বুঝতেরছ না? বড় বোনের বিয়ে দিতে গিয়েই বাবা প্রায় নিঃসম্বল, ছোট বোন দুটো এখন কলেজে আর ভাইটা স্কুলে পড়ছে। ঘটার বিয়ে হলে লোকজনের ভিড় হয়ই, আর কনের সঙ্গে তারা আর কি ঘরে আসছে তা-ও লক্ষ্য করে। তুমি যখন বড়লোকের সালঙ্কারা কন্যা ঘরে এনে তুলছ না, আমার দিকের দৈন্য সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দরকার কি? এর থেকে নিঝঞ্ঝাটে রেজিষ্ট্রি বিয়ে অনেক স্বস্তির হবে।

সমর ঘোষাল খাওয়া থামিয়ে শুনল। আরো মুগ্ধ হল। মাথা নেড়ে আন্তরিক সায় দিল।খুব যুক্তির কথা, মা একটু খুঁত খুঁত করবে, কিন্তু কি আর করা যাবে! ঠিক আছে, রেজিষ্ট্রি বিয়েই হবে।

এবারে অতসীর সোজা-সরল প্রশ্ন, এ-তো হল, তারপর?

-তারপর কি?

বিয়ের পরের প্রোগ্রামটা কি?

–আই এ এস পরীক্ষায় ওপরের দিকে ঠাই পাওয়ার জন্য এবারে আরে আদা জল খেয়ে লাগব…মনে হয় ভালোই করব।

নিরুত্তাপ গলায় অতসী বলল, মনে হয় কেন, পরীক্ষা দিলে ভালো করবেই। …কিন্তু আমার দিকটা তাহলে ভাবছ না–

www.bengaliebook.com

সমর ঘোষাল শশব্যস্ত, কেন কেন–তোমার কথা ভেবেই তো আমার আরো বেশি পছন্দ–কিন্তু তুমি কি ভাবার কথা বলছ?

অতসী মুখের দিকে চেয়ে টিপটিপ হাসছে।–তুমি আই এ এস অফিসার হয়ে জায়গায়-জায়গায় ঘুরে বেড়াবে আর আমি তাহলে সেই অতসী ফুলটি হয়েই কেবল তোমার ঘরের শোভা বাড়াবো?

এ দিকটা ভাবা হয়নি বটে, সমর ঘোষাল মনে মনে একটু হোঁচট খেয়ে উঠল। তারপর ব্যস্ত মুখেই বলল, তোমারও তো কোয়ালিফিকেশন কম নয়, তুমিও ভালো চাকরি পেয়ে যেতে পারো, আর গভর্নমেন্টের চাকরি হলে দুজনের এক-জায়গায় থাকতেও অসুবিধে হবে না।

মুখে হাসির আভাস লেগেই আছে। দুচামচ ফ্রায়েড-রাইস চালান দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলল, পাঁচ বছর ধরে ছেলে-মেয়ে পড়াচ্ছি, এই এক চাকরি ছাড়া আমার আর কিছু ভালো লাগবে না। বি. এ এম. এ-র একটাতেও ফার্স্ট ক্লাস পেলাম না, গভর্নমেন্ট কলেজে চাকরি পাওয়ার কোনো আশা নেই, এ তুমি খুব ভালোই জানো। গভমেন্ট স্কুলে চাকরি পেতে পারি হয়তো, কিন্তু আই এ এস অফিসারের বউ স্কুল। মাস্টার এটা তোমার খুব ভালো লাগার কথা নয়, আর এখানকার প্রাইভেট কলেজের চাকরি যদি জোটেও তোমার বদলীর চাকরির সঙ্গে খাপ খাওয়ার কোনো আশাই নেই, তখন তুমি এক জায়গায় আমি এক জায়গায়। গা-ঝাড়া দিয়ে হেসে নিল একটু, মোটকথা তোমার ওই আই এ এস চাকরি আমার একটুও পছন্দ নয়।

বলার সুরটুকু এমনি সহজ অথচ স্পষ্ট যে সমস্যাটা সমর ঘোষালের কাছে। আন্তরিক হয়ে উঠল। একই সঙ্গে চিন্তার কারণও। বলল, তাহলে এ-রকম একটা বাজে কলেজেই পড়ে থাকব?

-তা কেন, আগাগোড়া ভালো কেরিয়ার তোমার, ইংরেজির মতো সাবজেক্ট একটাতে ফার্স্ট ক্লাস আর একটাতেও অদ্বিতীয় সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট, এই প্রভিন্সের এতগুলো য়ুনিভার্সিটির কোথাও না কোথাও অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারো–পারো না?

সমর ঘোষাল সায় দিল, তা পারি।

উৎসাহে অতসীর মুখখানা আরো সুন্দর লাগছে।–টিচিং লাইনে এলে কত ছুটি ভেবে দেখেছ, আর কত সুবিধে? নিজেদের মধ্যে আমরা কত সময় পাক-ইচ্ছে করলে, তুমি ডক্টরেটের থিসিস সাবমিট করতে পারো, পয়সা করার ইচ্ছে থাকলে ছাত্রদের জন্য দরকারি বই লেখারও অঢেল সময় পেতে পারো–আই এ এসএর পিছনে ছুটে কেবল প্রতিপত্তি ছাড়া খুব বেশি আর কি পাবে?

কান জুড়নোর মতোই কথা আর যুক্তি। সোৎসাহে বলল, বেশ বেশ। আমি কোনো যুনিভার্সিটির চাকরিতেই ঢুকে গেছি ধরে নাও কিন্তু তখন তুমি কি করবে?

অতসীর হালছাড়া হাসি আর জবাব, তখন আমার আর কি সমস্যা! যেখানে তুমি, আমিও সেখানেই। কলেজের মোহ আমার নেই, স্কুলের চাকরি তো একটা জোটাতে পরিবই! প্রোফেসর হলে তখন আমার স্কুলের চাকরি নিয়ে কারোই কোনো কমপ্লেকস থাকবে না–দুজনের রোজগারে দিব্যি চলে যাবে–তার বেশি আমাদের। দরকার কি?

সমর ঘোষাল মুগ্ধ চোখে খানিক চেয়ে রইলো। তারপর আধাভরাট খাবারের ডিশ ফেলে কেবিনের পর্দা ঠেলে বেরিয়ে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এলো। ফিরে এসে অতসীর গলা জড়িয়ে ধরে ফ্রায়েড রাইস আর চিলি-চিকেন খাওয়া মুখে গভীর একটা চুমু খেল।

অতসীর হাঁসফাস দশা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তুমি একটি অসভ্য!

সমর ঘোষাল বলল, তোমার থেকে আমি যত ভালো রেজাল্টই করি, প্র্যাকটিকাল বিচারবুদ্ধিতে আমি তোমার নখের যোগ্যও নই।

অতসর হাসিমুখ, সেই সঙ্গে ধমকের গলা, তাবলে ভক্তিশ্রদ্ধার ঠেলায় এরকম। হামলা! আরো সুযোগ সুবিধে থাকলে কি করতে?

শোনার পর সমর ঘোষালের দুচোখে সত্যিই তিমির তৃষ্ণা।

.

বিয়ে হয়ে গেল। অতসী গাঙ্গুলি অতসী ঘোষাল হল।

এর পরের সবকিছুই যেন তাদের ইচ্ছার অনুকূলে সাজানো। তাদের বলা ঠিক হল না, অতসীর। সমর ঘোষাল যুগপৎ খুশি এবং অবাক হয়ে দেখছে পরের সব পদক্ষেপ অতসীর হিসেব মতোই দুজনকে বাস্তবের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

…ভালো মতো একটু নড়া-চড়া করতে দেখা গেল অতসীর কথা মিথ্যে নয়, কলেজ-য়ুনিভার্সিটির চাকরি যেন তার জন্য হাঁ করেই ছিল। মফঃস্বল কলেজের সরকারী চাকরি পছন্দ হল না, নর্থবেঙ্গল য়ুনিভার্সিটিতে লেকচারারের পোস্টটাই পছন্দ। এখানকার শ্রদ্ধেয় ইংরেজির প্রোফেসারও এই চাকরিই নিতে পরামর্শ দিলেন। আর বললেন, এ-লাইনেই এলে যখন যত তাড়াতাড়ি পার ডক্টরেটটা করে নাও, নইলে এগোতে অসুবিধে হবে।

সমর ঘোষাল তারই আন্ডারে রিসার্চ করবে স্থির করেই রেখেছিল। ভদ্রলোকের খবই স্নেহের পাত্র সে, খুশি হয়েই রাজি হয়ে গেলেন। কয়েক দিনের আলোচনায়। রিসার্চের বিষয়ও স্থির করে অতসীকে নিয়ে সে শিলিগুড়ি রওনা হয়ে গেল। প্রোফেসার দূরে থাকলেও অসুবিধে কিছু হবার কথা নয়। মাঝে মধ্যে কলকাতায় আসতে হবে, ভেকেশনগুলো আছে, এটা কোনো বাধাই নয়।

য়ুনিভার্সিটি ক্যামপাস কলেজ থেকে অনেকটাই দূরে। এই এলাকায় ঘর আগেই ঠিক করে রেখে গেছল। দোতলা বাড়ির একতলায় দুখানা বড় ঘর, কিচেন বাথ ইত্যাদির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাও অপছন্দের নয়। কলকাতার ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে এ রকম ফাঁকা জায়গায় এসে অতসী খুশি। শিলিগুড়ি শহরেও শুনেছে লোকের মাথা লোকে খায়, শহরের ভিতর দিয়ে আসার সময় যেটুকু দেখেছে তাতেই হাঁপ ধরার দাখিল। এখানে এসে ওঠার পর একটু কেবল খুঁতখুঁতুনি থেকেই গেল। বড় হলেও ঘর মাত্র দুখানা। এরপর লোকজন আসা শুরু হলে তাদের কোথায় বসাবে কি করবে? যাক, অতসী

কোন কিছুতে ঘাবড়াবার মেয়ে নয়, পুরুষের বুদ্ধিতে যেটুকু হয়েছে তাই যথেষ্ট, পরে দেখা যাবে।

নতুন একটা সংসার পেতে বসার ঝামেলা যে কত, দেখে প্রায় অসহায় অবস্থা সমর ঘোষালের। ব্যবস্থা করা আর গোছগাছের ঠেলায় অতসীর ফুরসৎ তো নেই-ই, নতুন কর্তাটিরও নাজেহাল দশা। তার ওপরেও ফরমাশ বর্ষণ হয়েই চলেছে, এটা আনো ওটা আনো, এটা করো ওটা করো। অতসীরও তো নতুন সংসারই, সব একেবারে মনে পড়ে না। ফলে যা একবারে হয়ে যায় তার জন্য তিন বার করে। ছোটাছুটি। আবার ফরমাশ অনুযায়ী যা আনে তার বেশিরভাগই পছন্দ হয় না, নাক-মুখ কুঁচকে বলে ওঠে, এ-রকম আনলে কেন–ও-রকম পেলে না? এ মা, প্লাস্টিকের এত বড় বালতি আনতে বলেছি তোমাকে! দেখ কাণ্ড, কিচেন বাথরুম টয়লেটের জন্য তিনটেই লাল মগ–কোনো বুদ্ধি যদি থাকত, বদলাবদলি হয়ে গেলে টের পাবে!

ঘাম ঝরা নাক-মুখ কোঁচকানো মূর্তিখানা চোখে মিষ্টিই লাগে সমর ঘোষালের, তাই বিরক্তির বদলে হাল ছেড়ে বসে পড়ে।আমার দ্বারা আর কিসসু হবে না, আমার বদলে ওই ছেলেটার ওপর তোমার সর্দারি চালাও।

ছেলে বলতে ওপরতলার ভদ্রলোকের ঠিক-করা কাজের লোকটা। জোয়ান, গাঁটা-গোট্টা চেহারা, ভাবলেশশূন্য পালিশ করা মুখ, নাম শেরিং। এই তিন দিন ধরে তার নীরব দর্শক আর কলের পুতুলের মতো হুকুম তামিলের ভূমিকা। বাংলা বলতে পারে না, ভাঙা-ভাঙা হিন্দি বলতে পারে এবং বোঝে। গত তিন দিন যাবত এই বংগালী মেমসাবটি তার মনোযোগী দ্রষ্টব্যের একজন। অতসী চাপা গলায় গজগজ করে উঠল, একটু গুছিয়ে নিয়েই ওকে আমি তাড়াব, সব টানা-হেঁচড়া করতে করতে কতবার করে বুকের কাপড় কাঁধের কাপড় সরে যাচ্ছে, ওর হাঁ-চোখ দৃষ্টি তখনো নড়ে না–

একটা সিগারেট ধরাবার ফাঁকে সমর ঘোষাল আড়চোখে লোকটাকে দেখে নিয়ে বলল, বুক-কাঁধের কাপড় তাহলে আর একটু বেশি-বেশি সরাও,

দেখবে ও খুশি হয়ে আমার থেকে ঢের বেশি পছন্দ মতো তোমার সব কাজ করে কম্মে দেবে।

কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে অতসী বড় স্টিল ট্রাঙ্কটার ও-ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠাট্টার জবাবে গম্ভীর মুখে দেখে নিল একবার তারপর লোকটার দিকে ফিরল।-শেরিং!

দুচোখ তার মুখের ওপরেই ছিল। গলা দিয়ে বিড়বিড় শব্দ বার হল, জি মেমসাব

পাঁচ-পাঁচটা বছর মাড়োয়ারী বাড়িতে মাস্টারী করার ফলে অতসী হিন্দিটা মোটামুটি রপ্ত করেছে। আঙুল দিয়ে ট্রাঙ্কটার উল্টো দিক দেখিয়ে হুকুম করল, ইধার আও।

সমর ঘোষাল বুঝল ট্রাঙ্কটা যেখানে ছিল সেখানে রাখা আর পছন্দ নয়, অন্যত্র সরাবে। এ-রকুম ওলট-পালট করেই চলেছে। শেরিং এগিয়ে এসে যথাস্থানে দাঁড়ালো। ভাবলেশশূন্য দুচোখ তখনো কর্ত্রীর মুখের ওপর।

-আপনা দো আঁখো জমিন পর রাখো।

এবারের হুকুম শুনে সমুর ঘোষাল এস্ত একটু। লোকটা তাই করল। দুচোখ নিজের পায়ের দিকে নামালো।

–আব উধার পাকড়ো–আঁখো মাৎ উঁচানা

ঝুঁকে অতসী নিজে ট্রাঙ্কের এ-দিকের আংটা ধরল।–লে আও।

ধরাধরি করে ঢাউস ট্রাঙ্ক পছন্দের জায়গায় রেখে অতসী সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কাজ সেরে লোকটাও মুখ তুলেছিল, কিন্তু সমর ঘোষাল আশ্চর্য হয়ে দেখল, কীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দুচোখ আবার মাটির দিকে।

আব তুমি বাহার যা কে ঠায়রো, হম বোলায়গা।

ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। দৃষ্টি তার পরেও পায়ের দিকে।

সমর ঘোষাল এবার চাপা গলায় বলে উঠল, এ-রকম করলে লোকটা পালাবে যে!

অতসীর গম্ভীর মুখের দুই ঠোঁটে এবারে একটু হাসির ফাটল। বলল, বেশি বাড়লে তোমারও ওই দশা হবে।

সমর ঘোষালের মনে হয়েছে এই ব্যক্তিত্বের মাধুর্যটুকুই দুচোখ ভরে দেখার মতো।

.

দিন সাতেকের চেষ্টায় সব-কিছু চলনসই। মনে হল অতসীর। বড় সমস্যা ছিল রান্না নিয়ে। কারণ কলকাতায় যেভাবে দিন কেটেছে, অতসীর কখনো রান্নাঘরে ঢোকার সময় হয়নি। এ-ব্যাপারে তার সহজাত ঝোঁকও নেই। ওপরতলার ভদ্রলোক বলে দিয়েছিলেন, বাঙালি বাড়িতে কাজ করে করে শেরিং মোটামুটি রান্নাও শিখেছে। দুতিন দিন য়ুনিভার্সিটি-ক্যান্টিন থেকে খাবার আনিয়ে লাঞ্চ ডিনার সারা হয়েছে। কিন্তু এ-ব্যবস্থা কদিন আর চলতে পারে, তাছাড়া ক্যানটিন খুব কাছেও নয়। শেরিং কলের মানুষ, তাই কর্তীর কোনো হুকুমে তার মুখে বিরক্তির ছায়া নেই। আর তার দুচোখও এখন সর্বদা মাটির দিকে। অতসী লক্ষ্য করেছে সকালের ব্রেকফাস্ট চা টোস্ট ডিমসেদ্ধ বা ওমলেট তার আয়ত্তের মধ্যে, বিকেলেরটা এপর্যন্ত পরখ করা হয়নি, কারণ ক্যানটিনে সে-সময় লুচি-পুরি তরকারি আলুর দম ভালোই মেলে। অতসী হুকুম করা মাত্র কলের মানুষটা আশ্চর্যরকম তৎপর হয়ে তড়িঘড়ি নিয়ে আসে। অতসী এরপর তাকে রান্না ঘরে ঠেলেছে। জিগেস করা মাত্র সে বলেছে বাঙালী রান্না সে সবই জানে। কিন্তু তার জানার বহর দেখে প্রথম দিনই সমর ঘোষালের দুচোখ কপালে। ভাতে খুব ত্রুটি নেই, কেবল সেদ্ধ একটু কম, ডালের সঙ্গে ভাজাও ঠিকই আছে, কিন্তু ডালটাকে ফ্রায়েড ডাল বলা যেতে পারে। তরকারি যা পাতে পড়ল সেটা একটা স্বাদশূন্য রকমারি আনাজের ঘাট, মাছের ঝোল একদিকে আর কড়া ভাজা মাছের খণ্ড আর একদিকে। তা-ও ছনছনে ঝাল।

প্রথম দিনের রান্না কিছুটা চালান দিয়েই হতাশ গলায় সমর ঘোষাল বলে উঠেছিল, এবারেই হয়ে গেল, দুজনেরই আলসার অনিবার্য।

অতসী কিন্তু মোটামুটি খেতে পেরেছে। ধমকের সুরে বলেছে, একটু ধৈর্য ধরো তো, বলে দিলে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু সাহেবের খাওয়া দেখে শেরিঙের নিজেরই খটকা লেগেছে। চার ভাগের তিন ভাগ তার পাতে পড়ে। নিজের পায়ের দিকে চোখ নামিয়ে মেমসাহেবের কাছে নিবেদন করেছে, মিট-কারি, এগ কারি সুপ-এ-সব হলে সে ভালো খানা পাকাতে পারে।

দেখা গেল এ-গুলো সত্যিই চলনসই। কিন্তু দুবেলা এই একই জিনিস কাহাতক চলে। দুদিন না যেতে বিরক্ত হয়ে সমর ঘোষাল বলে উঠেছে, শোনো, আমার জন্য সব কেবল সেদ্ধ করে রাখতে বোলো, আমি সেদ্ধ-ভাত খাব! ডাল তরকারি সুক্তোর স্বাদ তো ভুলতেই বসেছি।

শোনামাত্র অতসীর তপ্ত মুখ।-আমি যা পারি না তা নিয়ে খোঁচা দিয়ে লাভ কি, তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, দেখেশুনে একজন রাঁধুনি বিয়ে করলেই ভালো। করতে। রোসো দুদিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

দুদিন যেতে দেখা গেল সত্যি অনেকটাই ঠিক হয়ে এসেছে। ডাল তরকারী মাছ সবই মুখে দিতে পারছে। কি ব্যাপার? না, অতসী সোজা গিয়ে ওপরতলার গৃহিণীর শরণাপন্ন হয়েছিল। সমস্যার কথা শুনে তিনি নেমে এসে হাতে ধরে শেরিংকে এই তিনটি জিনিস রাঁধতে শিখিয়েছেন। এখন নাকি সুলে রাঁধতে শেখাচ্ছেন। অতসী হেসে সারা, মহিলা যা দেখান যা শেখান শেরিঙের মাটির দিকে চোখ, শেষে ধমক খেয়ে বুঝেছে রান্না শেখার জন্য তার দিকে তাকানো যেতে পারে।

সাত আটদিন যেতে অতসী নিজের ভাবনা ভাবতে বসল। স্কুলের চাকরি একটা জোটাতে হবে। কেবল এখানে কেন, কালিম্পং কারসিয়াং দার্জিলিং-এ যেতে হলেও তার আপত্তি নেই। মেয়েদের হস্টেলে থাকবে, শনি রোববারে বা অন্যান্য ছুটির দিনে চলে আসবে। এ কটা দিন যেতে সমর

ঘোষালও মোটামুটি সুস্থির। ঘর গোছানো আর সংসার পাতা নিয়ে অতসীর ফরমাশের পর ফরমাশ, অন্যদিকে ছাত্র পড়ানোর প্রস্তুতি–কোনো দিকে তাকানোর অবকাশ ছিল না। পরামর্শের জন্য অতসী তাকে টেনে এনে সামনে বসালো–ইংরেজিটা তুমি আমার থেকে ভালো জানো যখন নিজে আর কষ্ট করি কেন, আমার বায়োডাটা দিয়ে দরখাস্তের জেনারেল একটা খসড়া করে দাও, তারপর চেষ্টা শুরু হোক, এ কটা দিন তো নিজের তালেই কাটালে—

মুখের দিকে চেয়ে এই প্রথম কি একটু ব্যতিক্রম চোখে পড়ল সমর ঘোষালের। উঠে এসে সামনে দাঁড়ালো। –দেখি দেখি! দুহাতে মাথাটা ধরে সামনে টেনে নিবিষ্ট চোখে কিছু দেখার চেষ্টা, সঙ্গে মন্তব্য, একটা মাইক্রোসকোপ থাকলে ঠাওর করা যেত

অতসীর গলা দিয়ে প্রায় আর্তনাদের মতো বেরুলো, কি–পাকা চুলটুল নাকি?

সমর ঘোষাল হাসতে লাগল, বলল, না, লাল আঁচড়ের মতো একটু কিছু চোখে পড়েছে, এ কদিন খেয়ালই করিনি, কপালে এমন সুন্দর টকটকে সিঁদুরের টিপ পরতে, সিঁথির সিঁদুরও আগুনের শিখার মতো জ্বলজ্বল করত–সে-সব এরই মধ্যে বাতিল!

যাও! অতসী দুহাতে তাকে ঠেলে সরালো। কলকাতায় তোমার মায়ের পছন্দে ও-রকম পরতে হত, এখানে আমি ও-রকম গেঁয়ো সেজে বেড়াবো?

-সঙ কেন, তোমার ফর্সা কপালে অমন টকটকে সিঁদূর টিপ আমার তো খুব ভাল লাগত, আর মনে হত একমাত্র আমি ছাড়া আর সক্কলের বেশি কাছে আসা নিষেধ।

অতসীর মুখে রাগত হাসি।আর এখন কি মনে হচ্ছে, দুহাত বাড়িয়ে সকলকে আমি কাছে ডাকছি?

সমর ঘোষাল মাথা নেড়ে সায় দিল, অর্থাৎ সে-রকমই লাগছে। তারপর নিরীহ প্রশ্ন, শেরিংকে ডেকে যাচাই করে নেব?

–যা বললাম, বসে করবে না এইসব করবে?

জবাবে আগে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল।–তা করতেই বা হাত উঠছে কই, এখন ধরো তোমার যদি কারসিয়ঙ বা দার্জিলিং-এ চাকরি হয়, আমার ভালো লাগবে? এখন তো ভাবনা আরো বাড়ল, তোমাকে কুমারী ভেবে ভালো লোকও যদি বেশি কাছে আসতে চায় তাকে দোষ দেওয়া যাবে না।

সমর ঘোষাল আশা করেছিল এতটা বলার পর ওই ফর্সা কপালে ছোট হলেও একটা সিঁদুর টিপ আর সিঁথির লাল আঁচড় আর একটু উজ্জ্বল দেখবে। এ কদিনে ওটুকু ভারী পছন্দের হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু দেখা গেল না।

তিন দিনের মধ্যে এই একই প্রসঙ্গে আবার একটু মজার যোগাযোগ। অতসী এখানকার সব থেকে নামকরা মেয়ে স্কুলে এসে হাজির। ব্যাগে দরখাস্ত। নারভাস হবার মেয়েই নয় সে। অফিসের কেরানীর কাছে আগে প্রিন্সিপালের নাম জেনে নিল, মিসেস হৈমন্তী খাসনবিশ। তারপর বেরিয়ে এসে স্লিপে নিজের নাম লিখতে গিয়েই ভুল। লিখেছে শ্রীমতী অতসী গাঙ্গুলি। বিরক্তির একশেষ। দ্বিতীয় স্লিপে শ্রীমতী অতসী ঘোষাল লিখে বেয়ারার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিল। দুতিন মিনিটের মধ্যেই ডাক এলো।

বরাতটাই বোধহয় খারাপ আজ। ঘরে পা দিয়ে নিজের অগোচরেই একটু অভব্যতা করে ফেলল। কারণ স্কুলের কোনো প্রিন্সিপালের এমন দশাসই চেহারা তার কল্পনার। বাইরে। পোশাক পরিচ্ছদও একটু বিচিত্র ধরনের। বিশাল টেবিলের ওধারে মস্ত একটা রিভলভিং চেয়ার জুড়ে বসে অল্প অল্প দোল খাচ্ছেন। পরনে সাদা সিল্কের শাড়ি, গায়ে কাজ করা সিল্কের সাদা ব্লাউস, তার ওপর সাদা কাজ করা খয়েরি রঙের ঢাউস একটা দুক-খোলা এপ্রনগোছের হাফ-হাতা লং কোট। মাথায় অবিন্যস্ত সাদা-কালো চুলের বোঝা। নাকের নিচে ঘন লোম, দুই গালেরও অনেকটা আর হাতের কনুই

থেকে যেটুকু চোখে পড়ে তা-ও ঘন লোমে বোঝাই। মুখের ছাদ পুরুষালি। শাড়ি পরা না থাকলে বা খোলা এপ্রনের মাঝখানে বক্ষের বিপুল স্তন-ভারের আভাস না দেখা গেলে মেয়ে কি পুরুষ ভেবে দুচোখ আরো বেশি বিভ্রান্ত হত।

.

ইয়েস? আই অ্যাম মিসেস খাসনবিশ, সীট ডাউন প্লীজ! হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?

অতসী ধরেই নিল সে ফেল। মানে মানে এখন সরে পড়লেই হয়। সেটা করা আরো বিসদৃশ। দুহাত জুড়ে একটু বেশি আনত হয়ে শ্রদ্ধা জানালো। মহিলার দিক থেকে তার কোনো জবাব মিলল না। বিশাল টেবিলের এ-ধারের চেয়ারে মুখোমুখি বসল। কিন্তু তার চোখে চোখ রাখতে মনে হল, উনি যেন প্রথম দর্শনে ওর ভেবা চ্যাকা খাওয়া মূর্তি দেখে বেশ মজা পাচ্ছেন।

অতসী সবিনয়ে জানালো, সে একটা চাকরির চেষ্টায় এসে তাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছে, এই এই কোয়ালিফিকেশন, যদি কোনো সুবিধে হয়।

মিসেস খাসনবিশ ঝুঁকে আর একবার স্লিপের নামটা দেখলেন। গলার স্বর এমনিতেই ফ্যাসফেসে, প্রশ্ন আরো রুক্ষ। এম, এ অ্যান্ড বি, এ ফ্রম হোয়াট য়ুনিভার্সিটি?

–ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি?

–দেন হোয়াই হিয়ার?

অতসী সবিনয়েই জানালো, হাসব্যান্ড এখানকার য়ুনিভার্সিটিতে জয়েন করেছেন তাই সে এখানে। মাত্র আট দশদিন হল তারা এখানে এসেছে।

তখুনি সেই সিঁদুর প্রসঙ্গের পরোক্ষ যোগাযোগ। হাসব্যান্ড শুনে প্রিন্সিপাল লোমশ দুই হাত টেবিলের ওপর রেখে সামনে ঝুঁকলেন, থলথলে মুখের

দুচোখ তার দিকে নিবিষ্ট হল। তারপর মন্তব্য, ইউ আর ম্যারেড দেন…! ক্রিশ্চিয়ান?

–না হিন্দু।

শুনে কৌতূহল বাড়লো যেন।–কতদিন বিয়ে হয়েছে?

–মাস দুই আগে…।

থলথলে মুখে হাসির আভাস একটু। আবারও তেমনি ঝুঁকে বসেই নিরীক্ষণ করলেন একটু। তারপর সোজা হয়ে বসে বললেন, আই অ্যাম সরি, ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ-এর জন্য আমার একজনই ইকনমিকস-এর টিচার আছে। তার রিটায়ারমেন্টের এখনো বছর দুই বাকি

ফ্যাসফেসে গলার স্বর একটু সদয় মনে হল অতসীর। দ্রুত ভেবে নিল, দুটো বছর সে যে কোনো নিচু ক্লাসেও পড়াতে প্রস্তুত, বলবে কি বলবে না। কিন্তু তার আগেই মিসেস খাসনবিশ বললেন, বাট আই মে ট্রাই টু হেল্প ইউ..জলপাইগুড়ির গার্লস স্কুলের হেডমিসট্রেস আমার বন্ধু, শী রিগারডস মি, তার স্কুলে ইকনমিক্স-এর একটা লিভ ভেকেন্সির পোস্ট খালি আছে শুনেছি, তাঁর ইকনমিক্স টিচারের টিউবারকিউলোসিস ধরা পড়তে সে লং লিভ এ আছে, তিন চার দিন আগে হেডমিসট্রেস আমাকে ফোনে জিগেস করেছিলেন, আমার চেনা-জানা কেউ আছে কিনা, আপনি

অতসী তক্ষুনি বলে উঠল, আমাকে আপনি বলে লজ্জা দেবেন না

খুশি।–অলরাইট, গো অ্যান্ড সি হার, এর মধ্যে কাউকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিনা জানি না, যদি না নেওয়া হয়ে থাকে, ইউ হ্যাভ ফেয়ার চান্স…ইউ মে রেফার মি।

মহিলা এতটা সদয় হতে পারে আশাতীত। জলপাইগুড়িতে চাকরি হলে এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা জল-ভাত ব্যাপার। অতসী আর একটু ঝুঁকে কৃতজ্ঞতায় টুপটুপু সুরে বলল, ইউ আর সো কাইন্ড ম্যাডাম, যেখানেই চাকরি করি দু বছর বাদে হলেও আমি এখানে আপনার আশ্রয়ে

আসব এই আশা নিয়ে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে অ্যাপ্লিকেশন আছে, যদি অনুমতি করেন তো এখনই সেটা রেখে যেতে পারি…।

থলথলে মুখের খাঁজে খাঁজে হাসি উছলে উঠল।–্যু ইয়ার..এ লং টাইম মাই ডিয়ার, হাউ এভার ইউ রিয়েলি দিস বিজনেস…অ্যান্ড দ্যাটস গুড। লোমশ হাত বাড়িয়ে দিলেন, লেট মি হ্যাভ ইট।

ব্যাগ খুলে তৎপর হাতে অতসী অ্যাপ্লিকেশনটা বার করে খসখস করে নিজের নাম সই করল। তারপর একটু থমকে জিগেস করল, ডেট দেব?

-ও সিওর…আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু বি ফেয়ার-ডেট, উইল ক্লেইম প্রায়রিটি, হু নোজ দ্যাট দি প্রেজেন্ট ইকনমিক্স টিচার উইল নট কুইট, আরলিয়ার…আই ডোন্ট লাইক হার, নাইদার সি ডাজ মি, নাও আই হ্যাভ ওয়ার্কস, টু ডু উইশ ইউ গুড লাক।

বলবে না বলবে না করেও হেসে গড়িয়ে কর্তাটির কাছে প্রিন্সিপাল মিসেস। খাসনবিশের তাকে কুমারী ভাবার কথাটা না বলে পারল না। আগে ইন্টারভিউর আদ্যোপান্ত বলে পরে এটুকু শুনিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হতাশায় যেন ভেঙে পড়ে সমর ঘোষাল অতসীর গা-ঘেঁষে শুয়ে পড়ল।–তাহলে বোঝ, ঝানু মহিলারাই তোমাকে কুমারী ভাবছে, পুরুষেরা হামলে পড়বে না কেন?

তাকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করে অতসী হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু আমার তো মনে হয়, আমাকে কুমারী ভেবে ঠকেছেন বলেই উনি পরে বেশি সদয়।

সমর ঘোষাল তড়াক করে উঠে বসেছে, মিসেস খাসনবিশ সধবা না বিধবা?

জব্দ করার জন্যেই অতসী জবাব দিল, সবাই শুনেছি, কিন্তু কপালে সিঁথিতে সিঁদুরের বংশও নেই (শেষেরটুকু সত্যি)।

সমর ঘোষাল চোখ পাকালো তুমি আর ওই স্কুলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

দেখা গেল চাকরির ভাগ্য অতসীরও খারাপ নয়। জলপাইগুড়ি স্কুলের চাকরিটা পেল। হেড মিসট্রেস তাকে পরের সপ্তাহ থেকেই জয়েন করতে বলেছেন। সমর ঘোষালও আপাতত নিশ্চিন্ত। এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা কঠিন কিছু নয়। সমূহ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকল না।

কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাতে অতসী তার পরদিনই এখানকার মেয়ে স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস হৈমন্তী খাসনবিশের সঙ্গে দেখা করতে ছুটল। এবার দিনের সাক্ষাৎকারের মিয়াদ মিনিট দুই তিন। বললেন, দ্যাটস ইয়োর লাক, আই অ্যাম গ্ল্যান্ড। ওঠার আগে একবার শুধু জিগেস করলেন, যে পোস্ট-এই যাও হোল-টাইম সীনিয়র টিচারের ইলেভেন টুয়েলভ ছেড়ে ক্লাস নাইন টেন-এও পড়াতে হয়…হোয়াট এলস। ইউ ক্যান্ টিচ?

–বি. এ পাএ ম্যাথস্ ছিল..ইংরেজিও পড়াতে পারি।

অতসী পিছু হটার মেয়েই নয়।

–থিংক, দ্যাট উইল ডু, ও, কেউইশ ইউ গুড লাক এগেন।

উঠে আসার আগে অতসী সবিনয়ে বলল, আমাকে যদি আপনি একটু মনে রাখেন…

জবাবে জাঁদরেল মহিলার দুচোখ ওর মুখের ওপরে উঠে এলো।–ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল গেট রিপোর্টস ফ্রম মাই কাউন্টার-পার্ট দেয়ার।

সাদা কথায় তার ছাত্রী পড়ানোর কেরামতির খবর এখানে বসেই তিনি পাবেন, মনে রাখা না রাখা এর ওপর নির্ভর করবে। অতসী আর কথা বাড়ানো নিরাপদ বোধ করল না।

.

যে সহজ এবং সরল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ প্রায় সম-বয়সী একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে এত কাছাকাছি টেনে এনেছিল, সেই ব্যক্তিত্বের সংঘাতেই দুজনের দুদিকে ছিটকে যেতে দুবছরও সময় লাগল না। অবশ্য এই ব্যক্তিত্ব

তখন আর পরস্পরের কারো কাছেই সহজ বা সরল মনে হয়নি। ভুল দুজনেরই। স্বভাব বা ব্যক্তিত্ব কারোই বদলায়নি, কিন্তু গোড়ায় সেটা বুঝতে ভুল হয়েছে। প্রাথমিক মোহ কেটে যেতে এই ভুল দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অতসীর ভুল, বিদ্যায় বুদ্ধিতে চাল-চলন আচার-আচরণে পাঁচজনের চোখে পড়ার মতো একজন জোরালো পুরুষকে জীবনের দোসর হিসেবে পেতে চেয়েছিল। সমর ঘোষালের মধ্যে এই গুণগুলোই সে পুরোমাত্রায় দেখেছিল। নিজের ওপর এমনি প্রবল আস্থা যে, বিয়ের পর ধরেই নিয়েছিল এই জোরালো পুরুষটি এর পর ষোল আনা তার। ধরে না নেওয়ার কারণও নেই, একে একে তার সমস্ত ইচ্ছে মেনে নেবার পরেই এই বিয়ে। এর পরেও এই জোরালো পুরুষের সত্তসুষ্ঠু নিজের দখলে টেনে আনতে পারবে তাই বা ভাবতে যাবে কেন? এটুকু পারার মধ্যেই আনন্দ, পরিতৃপ্তি। নিজের জগতে বরাবরই সে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। সম্রাজ্ঞীর জগতে গুণধর শক্তিধর পাত্রমিত্র থাকবে বই কি। কিন্তু তার ইচ্ছের বোল আনা অধীনে থাকবে। সম্রাজ্ঞীর জগতের সে সম্রাট হলেও একই কথা। তারও ইচ্ছের অধীনে না থাকাটা বিদ্রোহের সামিল।

এখানেই ভুল অতসীর। তার ঘরের পুরুষের প্রবলতর সত্তার হদিশ সে পায়নি।

সমর ঘোষালের ভুল, অতসীর সব-কিছুর মধ্যে সে অনাড়ম্বর চরিত্রগত দৃঢ়তা। দেখত, সহজ ব্যক্তিত্বের মহিমা আবিষ্কার করত। মোহগ্রস্ত না হলে তার মতো মানুষের অনাপোস প্রবল ইচ্ছা আর ব্যক্তিত্বের মধ্যে তফাৎটা চোখে পড়ার কথা। চোখে পড়ার মতো অনেক নজিরই তো তার সামনে ছিল, যা তখন পড়েনি। আর তার ফলে। সমর ঘোষাল নিজেও মোহগ্রস্ত হয়ে ছিল না তো কি?

খিটির মিটির বাধতে লাগল অতি তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে। দোষের মধ্যে সমর ঘোষালের সবেতে উৎসাহ, সবেতে আগ্রহ। বাড়িতে লোক-জন আসা শুরু হয়েছে, ঘরে ভালো এক প্রস্থ টি-সেট ডিনার সেট এনে রাখা দরকার।

শুনেছে ফ্যান্সি মারকেটে এ-সব খুব ভালো পাওয়া যায়। কিন্তু সবকিছু সেখানে সাদা পথে আসে না বলে পুলিশের হানাদারিও হয় শুনেছে। ছোট বড় হাঙ্গামাও বাধে। তাই অতসীকেও সঙ্গে নিতে ভয়। কিন্তু একলা গেলে সমর ঘোষালের আর ভয়ের কি আছে, চোরাই মাল। তো আর কিছু কিনতে যাচ্ছে না। স্কুল করে ট্রেনে ফিরে বাড়ি পৌঁছুতে অতসীর প্রায় রাতই হয়ে যায়। এই ফাঁকে তাকে খুশি এবং অবাক করে দেওয়ার জন্য সমর ঘোষাল একাই ফ্যান্সি মার্কেটে চলে গেছে। তার বিশ্বাস অনেক দেখে আর যাচাই বাছাই করে চোখ-জুড়ানো জিনিসই এনেছে। কিন্তু দেখে শুনে অতসীর ঠাণ্ডা মুখে চাপা বিরক্তি, তোমাকে এমন সর্দারি করতে কে বলেছিল, আর দুটো চারটে দিন। সবুর সইলো না?

সমর ঘোষালের ভেবা-চ্যাকা খাওয়া মুখ।-কেন, তোমার পছন্দ হল না?

-না হলে কি করব, টি সেটের এত হালকা রং কদিন চকচকে থাকবে? ডিনার সেটের ডিজাইন আবার তেমনি জবরজং-এ বাপু চলবে না, বদলে নিয়ে এসো।

তিন বার করে ছোটাছুটি করে সমর ঘোষালের হাঁপ ধরার দাখিল, আর দোকানদারও বিরক্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতসীর ষোল আনা পছন্দের জিনিস আনাই গেল না।

অতসীর সময় কম, এটা ওটা আনার হুকুম হয়ই। নতুন আর এক সেট জানলা দরজার পর্দার কাপড় আনতে বলে গেছে। একটু বেশি দাম দিয়ে যতটা সম্ভব পছন্দের জিনিসই আনতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু দেখামাত্র মুখ গম্ভীর এবং বিরূপ মন্তব্য। তোমাকে আনতে বলাই আমার ভুল হয়েছে, কি যে টেস্ট না তোমার–এত দাম। দিয়ে এই জিনিস নিয়ে এলে! থান থেকে কেটে এনেছ আর তো বদলানোও যাবে না—

টেস্ট-এর কথা শুনেই সমর ঘোষাল খাপ্পা।–এগুলো তাহলে রাস্তায় ফেলে দাও, টাকা দিচ্ছি নিজের পছন্দের জিনিস নিয়ে এসো, আর কোনদিন আমাকে কিছু আনতেও বোলো না।

অতসীর কানের দিকটা লাল হয়ে উঠছে।–তোমার পছন্দের সঙ্গে আমার পছন্দ যদি না মেলে তাতে রাগের কি ভুল?

সঙ্গে সঙ্গে তির্যক জাব, আমার পছন্দের সঙ্গে তোমার পছন্দ মেলে বলেই তুমি আমার কাছে এসেছ।

-তার মানে? তুমি দয়া করে আমাকে এনেছ?

–না, তুমি দয়া করে এসেছ।

চায়ের টেবিলে এমনি তুফান লেগেই আছে।

অতসীর নিজের পছন্দের কিছু কিনতে হলেও চলনদার হিসেবে সমর ঘোষালকে সঙ্গে থাকতেই হয়। দুটো বেড-শিট আর পছন্দসই একটা বেড-কভার কেনা হবে। প্রথমটা নিয়ে যাচাই বাছাইয়ের প্রশ্ন নেই। অনেক দেখে যে দুটো বেড-কভার নিয়ে বিবেচনা, সমর ঘোষালের চোখে তার একটা তো ভারী সুন্দর লাগল। কিন্তু মতামত জিগেস না করা পর্যন্ত সে চুপ।

-বলো, এ দুটোর কোনটা নেব?

সমর ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে, আঙুল তুলে দেখালো, ওইটা অনেক বেশি সুন্দর।

ধারণা, অতসীরও ওটাই বেশি পছন্দ। কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে তার খুঁতখুঁতুনি বাড়তে থাকল। দুটোই আবার পাশাপাশি খুলে দেখা হল। তারপর মন্তব্য, ভালো তো…কিন্তু একটু বেশি গরজাস। আরো একটু বিবেচনার পর অন্যটাই দোকানদারের দিকে এগিয়ে দিল, নাঃ, এটাই দিন।

সমর ঘোষাল নিঃসংশয়, সে কিছু না বললে আগের পছন্দের জিনিসটাই ঘরে আসত।

কাউকে চায়ে বা ডিনারে ডাকলেও এমনি তুচ্ছ কারণে মতবিরোধ। ঘরে কেবল চা-কফি ভিন্ন আর কিছু হয় না। সবই, সবই কোনো ভালো রেস্তোরাঁ

থেকে আসে। সমর ঘোষাল যদি বলে, কাজু খাস্তা কচুরি চিকেন-কাটলেট আর ভালো কিছু সন্দেশ আনাও তো অতসী ভুরু কুঁচকেই প্রথমে সব বাতিল বুঝিয়ে দেবে, তারপর বলবে, কাজুর যা দাম তার বদলে চিপস করলেই হয়। আজকাল ওসব কচুরি মিষ্টি-টিষ্টি অচল। তার থেকে চীজ পকোড়া ফিশ-ফিংগার চিকেন প্যাটিস আর মিষ্টির বদলে পেস্ট্রি অনেক ভদ্রস্থ হবে। ডিনারে একজন যদি বলে বিরিয়ানি ফিশফ্রাই কোর্মা চাটনি। মিষ্টি হোক, অন্যজন অবধারিত বলবে, অত তেল মশলার হেভি মেনুর দরকার কি, তার থেকে ফ্রায়েড রাইস ফ্রায়েড প্রন চিলি-চিকেন আইসক্রিম হলে খারাপ হবে কিছু?

ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে এসে ঘরে ফিরে অতসী কিছুটা ক্লান্ত থাকে ঠিকই। মুখ হাতে জল দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ শুয়ে থাকে। কিন্তু সে-সময় সমর ঘোষালের কাছে। য়ুনিভার্সিটির কেউ এলে আর গৃহিণীর খোঁজ করলে তাকে ডাকতেই হয়। অতসীর ফর্সা মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। গলা দিয়ে চাপা ঝঝ বেরিয়ে আসেই।–তোমার কি দয়ামায়া বলে কিছু নেই? আমি কি তোমার শো-কেসের পুতুল, যে আসবে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে!

বাইরের লোক চলে যেতে তার পরেও তপতপে মুখ দেখে সমর ঘোষালও রেগে গিয়ে একদিন কেবল বলেছিল, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ওই চাকরি করতে বলেছিল, ছেড়ে দিয়ে দেখো না আমি চালাতে পারি কি না?

সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাত।–কি বললে? আর আমি যদি বলি তোমার চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেখো। আমি চালাতে পারি কিনা–ছাড়বে? তোমার চাকরিটা চাকরি আর আমারটা নয়?

কিন্তু সমর ঘোষাল রিসার্চের কাজে আর পড়াশুনায় মন ঢেলে দিতে, দেখা গেল অতসী সব দিন আর অত ক্লান্ত থাকে না।

খানিক বাদে শয্যা ছেড়ে উঠে আসে, কাছাকাছির মধ্যে ঘুর ঘুর করে, এটা ওটা টুকটাক পরামর্শের দরকার হয়, কিছু কেনার কথা মনে পড়ে, নয়তো কারো বাড়িতে বা কোথাও যেতে ইচ্ছে করে।

সমর ঘোষাল বিরক্ত হয়, আমাকে রিসার্চের কাজটা ভালোভাবে করতে দেবে না কি?

খুব গায়ে মাখে না, ঠোঁটে হাসির আভাস দেখা দেয়। সেদিন বলল, ডক্টরেট হয়ে তোমার বিদ্যেবুদ্ধি আর এমন কি বাড়বে?

–বিদ্যেবুদ্ধি একটুও বাড়বে না, সামনে এগোবার রাস্তাটা পরিষ্কার হবে।

–সেটা কত এগোবার রাস্তা-রিডার প্রোফেসার ভাইস চ্যান্সেলার পর্যন্ত? কথার সুরে শ্লেষ, তখন তোমার স্কুল মাস্টার বউ মনে ধরবে তো?

সমর ঘোষালের আগে যা মনে হয়নি এখন তা হয়।

...সে এম. এ তে ফার্স্ট ক্লাস না পাওয়ার দরুন এই একজনেরই কোনো আক্ষেপ দেখেনি, প্রস্তুতি সত্ত্বেও তার আই এ এস পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করেছে, আর আজও তার নাগালের বাইরে যোগ্যতা আর প্রতিপত্তি অর্জন করুক এটা চায় না।

গত দেড় বছরের মধ্যে সমর ঘোষাল বার তিনেক কলকাতায় গেছে। অতসী দুটো ভেকেশনে সঙ্গে এসেছে, কর্তব্যের দায়ে দুতিন দিনের বেশি শাশুড়ীর কাছে থাকেনি, বাপের বাড়িতে থেকেছে। সমর ঘোষালের কাছে এ-ও কম দৃষ্টিকটু ঠেকেনি, কারণ বয়স্কা বিধবা মা তাদের অপেক্ষায় দিন গোনে, বউকে বুকে আগলে রাখতে চায়। কিন্তু এ নিয়ে কিছু বললে অতসী তেতে ওঠে। বলে, এখানে এসে তো বেশির ভাগ সময় তুমি তোমার রিসার্চের প্রোফেসার আর বই-পত্র নিয়ে কাটাও, আমার কাহাতক ভালো লাগে–নিজের মা-বাবা ভাই বোনের কাছে কটা দিন থাকবো। তা-ও দোষের?

সমর ঘোষাল খুব ভালো করেই জানে ভদের অনটনের সংসারে অতসীর বন্ধনের। শিকড়টা কোনদিনই খুব গভীরে পৌঁছয়নি। এখনো মাঝে মাঝে মা-কে টাকা পাঠাতে হয় বলে তার বিরক্তি লক্ষ্য করেছে। পরের বোন দুটো অকর্মা বলে রাগ করে।

তৃতীয় বারে অতসী সঙ্গে আসেইনি। তার সাফ কথা, তোমার তো এখন ডক্টরেট হওয়ার স্বপ্ন, আর আমার লিভ ভেকেন্সির চাকরি কবে আছে কবে নেই ঠিক নেই, আমার তো চেষ্টা কিছু করতে হবে না এভাবেই চলবে?

–ছুটির মধ্যে কোথায় কি চেষ্টা করবে?

–আমার যেটুকু চেষ্টা ছুটির মধ্যেই করতে হবে, স্কুল কামাই করে চেষ্টা করতে গেলে যা আছে তা-ও যাবে–তাছাড়া এই ডেলি প্যাসেঞ্জারির চাকরি আর কতকাল। করব?

তর্ক না বাড়িয়ে সমর ঘোষাল তাকে রেখে একলাই চলে গেছে। আর অতসী দুর্জয় রাগে ফুঁসেছে।...ডেলি প্যাসেঞ্জারের চাকরি আর ভালো লাগে না এটা ঠিক, তা বলে চাকরি যাবার ভয় আর তেমন নেই বললেই চলে। যার জায়গায় আছে সেই মহিলা বিনে মাইনেয় আরো এক বছরের ছুটিতে। এলেও এই দেড় বছরে পড়ানোয় তার যা সুখ্যাতি হয়েছে, আর মেয়েদের কাছে সে এত পপুলার এখন। যে হেডমিসট্রেস তাকে এক-রকম আশ্বাসই দিয়ে রেখেছেন ওখানে থেকে গেলে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা তিনিই করতে পারবেন। এদিকে এখানকার বড় স্কুলে চাকরির আশার দিনও এগিয়ে আসছে। এই দেড় বছরের মধ্যে অতসীর প্রিন্সিপাল মিসেস খাসনবিশের সঙ্গে দুবার দেখা হয়েছে। দুবারই পুজোর পর গিয়ে দেখা করাটা শ্রদ্ধানিবেদনের সাক্ষাৎকারই বলা চলে। মিসেস খাসনবিশ অখুশি হননি। বলেছেন, ইওর হেডমিস্ট্রেস স্পিক্স হাইলি অফ ইউ, রোসো আরো কিছু দিন দেখি কি করতে পারি।

একটা তুচ্ছ উপলক্ষ্য ধরেই অতসী ঠাণ্ডা মাথায় শেষ ফয়সালা করে ফেলল। এই লোকের কাছে তার সম্রাজ্ঞীর আসন টলে গেছে, এটা স্পষ্টই বুঝেছে। কিন্তু সম্রাজ্ঞী নিজে এ আসনচ্যুত হতে রাজি নয়, এই এক ব্যাপারে তার কোনো আপোস নেই। অতএব শেষ ফয়সালার কিছু একটা উপলক্ষ্য কেবল দরকার ছিল।

www.bengaliebook.com

ইদানীং সমর ঘোষালের কাছে তিনটি মেয়ে পড়তে আসছিল। ছুটির দিনে সকালে বা সন্ধ্যায়। অতসী তাদের ধারে কাছে যেত না, ফরমাশ মতো শেরিং চা দিয়ে যেত। মেয়েরা মাস্টারমশায়ের স্ত্রীকে দেখার জন্য বা একটু আলাপ করার জন্য উৎসুক বুঝেও সমর ঘোষাল এটা-ওটা বলে কাটিয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে কাজ সারার জন্য ব্যস্ত হয়।

দিন কয়েক এটা দেখে অতসী সোজাসুজি জিগেস করেছে, এরা টাকা দিয়ে বাড়তি বিদ্যার্জন করতে আসে না এমনি?

-এমনি।

–ছেলেরা বুঝি আজকাল আর পড়াশুনা নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না, যত চাড় মেয়েগুলোরই?

বক্রোক্তির জবাবে ভ্রূকুটি।

–ছুটি-টুটির দিনে এ-রকমই তাহলে চলবে এখন?

–কেন, তোমার অসুবিধে হচ্ছে?

-খুব বেশি রকম অসুবিধে হচ্ছে! দুখানা মাত্র ঘর, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে অসুবিধে হয় কিনা তুমি বোঝো না?

সমর ঘোষালের উষ্ণ জবাব, এরা খেলা করতে আসে না, দুখানা ছেড়ে দশখানা ঘর হলেও তোমার অসুবিধেই হত…মনটাকে আর একটু উঁচুতে তুলতে চেষ্টা করো অতসী।

-কি? কি বললে তুমি? তোমার নিজের মন এত উঁচুতে এখন যে ওই মেয়েগুলোকে আমি হিংসে করি এ-ও ভাবতে পারলে তুমি? ওরা আমার ঈর্ষার পাত্রী?

অতসীর গলা খুব চড়ছে না কিন্তু দুচোখ দিয়ে গলগল করে বিদ্বেষ ঠিকরোচ্ছে।–চুপ করে না থেকে জবাব দাও!

-আমি কিছুই ভাবি না, ভাবতে চাই না–তুমিই ভাবিয়ে ছাড়ছ।

দেহের রক্ত-কণা মুখে আগেই জমছিল। মুখ থেকে চোখের দিকে ছুটেছে।

অন্য ঘরে চলে গেল। রাতে দুজনে মুখোমুখি বসে খাওয়া সারল, কেউ একটি কথাও বলল না। রাতে সমর ঘোষালের ঘুম আসতে দেরি হল। অতসী তখনো শয্যায় আসেনি। সকালে ঘুম ভাঙতে শয্যার দিকে তাকিয়েই বুঝল রাতে সে এ-ঘরে আসেনি।

সকালের প্রক্ষালন সেরে টেবিলে এসে বসল। মুখোমুখি চেয়ারে অতসীও। শেরিং পেয়ালা চায়ের পট টোস্ট-এর ট্রে টেবিলে রাখতে অতসী দুজনের পেয়ালাতেই চা ঢালতে ঢালতে শেরিংকে বলল, ঠিক হ্যায়

শেরিং টেবিল ছেড়ে সরে গেল। দুজনে দু-জনের পেয়ালা শুধু তুলে নিল, টোস্ট পড়ে থাকল। নিঃশব্দে দুটো চুমুক দেবার পর খুব ঠাণ্ডা গলায় অতসী বলল, শোনো, আমি ভেবে দেখলাম এ-ভাবে আর বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলতে চেষ্টা না করাই ভালো, তাতে দিনে দিনে অশান্তি আরো বাড়বে।

পেয়ালা মুখের কাছেই ধরা, সমর ঘোষালেরও ঠাণ্ডা প্রশ্ন, কি করতে চাও?

–করার একটাই আছে, আমার মনে হয় যত ঠাণ্ডা আর শোভনভাবে সেটা করা যায় দুজনের পক্ষেই ততো ভালো।

–ডিভোর্স…?

অতসীর ভুরুর মাঝে ভাজ পড়ল একটু। এইটুকুই জবাব। চায়ের পেয়ালা খালি করে সামনে রাখল।

পেয়ালায় বার দুই চুমুক দিয়ে সমর ঘোষাল জিগ্যেস করল, তোমার এ ডিসিশন ফাইনাল তাহলে?

www.bengaliebook.com

–হ্যাঁ, ভাঙা পেয়ালা জুড়তে চেষ্টা না করাই ভালো…আমার যতদূর ধারণা, বনিবনা হল না আর চিন্তাধারায় খাপ খেল না বলে মিউঁচুয়াল কনসেন্টে ডিভোর্স চাইলে ব্যাপারটা সহজেই ফয়সালা হয়ে যায়…যায় না?

-তা যায়।

-তাহলে তাই করো, সামনের বড় দিনের ছুটিতে আমরা কলকাতা চলে যাই…কিন্তু আমার দিকের কোনো উকিল জানাশোনা নেই…তোমার আছে?

সমর ঘোষাল সন্তর্পণে এক বড় নিঃশ্বাস তল করে নিল।–বাবার এক বিশেষ বন্ধুই এ সবের বড় উকিল, তোমার ব্যবস্থাও তিনি করে দিতে পারবেন। ব্যাপারটা তাতে সহজ হবে।

-খুব ভালো।…তাহলে এই কথাই রইলো, এই বড় দিনের ছুটিতেই আমরা কলকাতা যাচ্ছি, আমি আজ থেকেই আর ফিরছি না, সেখানে মেয়েদের হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে নেব, স্কুলের টেলিফোন নাম্বার রেখে যাব, তেমন দরকার হলে ইউনিভার্সিটি থেকে তুমি ফোন করতে পারো।

-হ্যাঁ, এতবড় ব্যাপারেও অতসী ধীর স্থির সম্রাজ্ঞীর ভূমিকা নিতে পেরেছে। সমর ঘোষাল সে তুলনায় কেবল স্তব্ধ, এবং তাজ্জব।

অতসীর এটুকুই সান্ত্বনা।

.

ঘোষাল নয়, অতসী গাঙ্গুলী স্কুলে বসে সমর ঘোষালের ফোন পেয়েছে সাড়ে তিন মাস বাদে। ও-দিকের গলার স্বর ঠাণ্ডা–তোমার একটা চিঠি এসেছে, মনে হয়। দরকারি…।

-কোত্থেকে?

–খামে এখানকার মেয়ে স্কুলের ছাপ দেখলাম।

-ও…! অতসীর গলায় আগ্রহ স্পষ্ট।-কি করা যায় বলো তো, রিডাইরেক্ট করলে তো আবার পেতে দেরি হয়ে যেতে পারে।

সমর ঘোষালের গলায় গম্ভীর শ্লেষ, আমাকে হাতে হাতে পৌঁছে দিতে বলছ?

ভিতরে যতই জ্বলুক, অতসীর গলায় সম্রাজ্ঞীর হাসি।খুব ইচ্ছে করলে নিয়ে : আসতে পারো…কেন, তোমার সেই ছাত্রীরা বাড়িতে পড়তে আসা বন্ধ করে দিয়েছে?

রাগে থমথমে গলা সমর ঘোষালের। ফোন ছেড়ে দেব?

-না, চিঠি এই রাতটা তোমার কাছেই থাক, আমি কাল ভোরের ট্রেনে গিয়ে নিয়ে নেব, মনে হয় ওখানকার স্কুলের চাকরিটা হল।…থ্যাংক ইউ।– ইচ্ছে করেই সমর ঘোষাল সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। অতসী আসতে শেরিং তার হাতে চিঠি তুলে দিয়েছে। অতসীর ফর্সা মুখ লাল। সম্রাজ্ঞীর ভূমিকায় দাঁড়িয়েই সে এখানে এসেছিল।

প্রিন্সিপাল মিসেস খাসনবিশের টাইপ করা দুলাইনের চিঠি। যত শীগগির সম্ভব দেখা করার নির্দেশ।

.

সীট ডাউন প্লীজ! লোমশ হাত দুটো টেবিলে রেখে মিসেস খাসনবিশ সামনে ঝুঁকলেন, এনিথিং সীরিয়াসলি রং উইথ ইউ?

অতসী হঠাৎ ভেবাচ্যাকাই খেয়ে গেল। মনে মনে এই স্কুলে চাকরিতে জয়েন। করার নিশ্চিত আশা নিয়েই এসেছে। শুকনো গলায় বলল, বেগ ইওর পারডন। ম্যাডাম?

মিসেস খাসনবিশ এটুকুতেই অসহিষ্ণু।তোমার জলপাইগুড়ির হেড-মিসট্রেস জানালেন, হাসব্যান্ডের সঙ্গে তোমার ডিভোর্স হয়ে গেছে, তবু আমি তোমার দরখাস্ত থেকে এখানকার ঠিকানা বার করেই চিঠি দিলাম,

www.bengaliebook.com

জাস্ট টু অ্যাভয়েড সাসপিশন অফ মাই কাউন্টার পার্ট দেয়ার, সি লাইকস ইউ ভেরি মাচ, এই স্কুলের খাম দেখলে তার প্রথমেই সন্দেহ হত, আমি তোমাকে ভাঙিয়ে নেবার মতলবে খাম দেখলে তার প্রথমেই সন্দেহ হত, আমি তোমাকে ভাঙিয়ে নেবার মতলবে আছি, অ্যান্ড থট এ য়ুনিভার্সিটি প্রোফেসার শুড আফটার অল বি এ জেন্টলম্যান। –দ্য লেটার শুড রিচ ইউ! নাও টেল মি হোয়াটস দি ম্যাটার-হোয়াট আই হার্ড…এ ফ্যাক্ট?

নানান অসুবিধে এড়ানোর জন্য জলপাইগুড়ির হেডমিসট্রেসকে বলতে হয়েছিল, চাকরি হলে এখানেও গোপন করা যাবে না। অতসীর মনে ভয়ই ধরে গেল, এর জন্যে মিসেস খাসনবিশ কি তাকে বাতিল করে দেবেন?

জবাব দিল, ঠিকই শুনেছেন…।

–বাট হোয়াই…মে আই নো?

–বনিবনা হচ্ছিল না…ঠিক অ্যাডজাস্ট করা যাচ্ছিল না।

–দ্যাট সিম্পল? সেটলড ইট মিউঁচুয়ালি?

অতসী মাথা নেড়ে সায় দিল। মহিলার দিকে চেয়ে কেন যেন একটুও ক্ষুব্ধ। মনে হল না তাঁকে। প্রশ্ন শুনে আরও আশান্বিত।আর ইউ হ্যাপি ইন জলপাইগুড়ি অর স্টিল ওয়ান্ট টু কাম হিয়ার?

–আজ বললে আজই জয়েন করতে পারি।

থলথলে মুখখানা হাসি হাসি।–ইউ হ্যাভ সাম লাক অ্যাট লিস্ট, যাঁর জায়গায়। তোমাকে নেবার কথা বলেছিলাম প্রিপারেটরি টু রিটায়ারমেন্ট লিভ-এ যাচ্ছেন, ইউ মে জয়েন নেক্সট মানডে-ইউ আর অতসী হোয়াট নাও?

গাঙ্গুলি…।

–ওকে–কাম্ উইথ এ ফ্রেশ অ্যাপলিকেশন।

এই শিলিগুড়িতেই আবার জীবন শুরু অতসীর। অতসী গাঙ্গুলির। মনে হয়েছে, এই ডিভোর্সের ফলেই প্রিন্সিপাল মিসেস খাসনবিশের তাকে নিয়ে নেবার আগ্রহ আরো বেড়েছে। কিছু দিন যেতে ধারণাটা আরো মনে বসে গেছে।...মহিলা তার কোয়ার্টারস এ একা থাকেন, স্কুলেরই দুটো ক্লাস ফোর কর্মচারী তাঁর বাবুর্চি এবং পরিচারক। টিচাররা সকলেই জানে তার স্বামী বর্তমান, কিন্তু চর্মচক্ষে কেউ সে ভদ্রলোককে কখনো দেখেনি। ভদ্রমহিলার যেমন মেজাজ তেমনি যাকে বলে হুইমজিকাল। আর খেতেও খুব ভালবাসেন। দুতিন জন পেয়ারের টিচারকে মাঝে মাঝে বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়ান। স্কুল কম্পাউন্ডের মধ্যেই মেয়েদের বোর্ডিং, আলাদা আলাদা ঘর নিয়ে। একপাশে জনাকয়েক টিচারও থাকে। অতসীরও এখানেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আধ বয়সী বোর্ডার টিচার তিনজনেই অবিবাহিত এবং অনেকটা নিঃসঙ্গ বলেই প্রিন্সিপালের স্নেহের পাত্রী হয়তো, কেবল তাদেরই নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হয়। বরাত জোরে অতসীও এদের সঙ্গে যুক্ত এখন। স্বচক্ষে মিসেস খাসনবিশের খাওয়ার বহর দেখে মনে হয়েছে, গতরখানা এমন হবে সে আর দোষের কি। মহিলার নতুন বয়সের চেহারাখানা কল্পনা করতে চেষ্টা করেছে।...পুরুষ অতসীর দুচোখের বিষ এখন, তবু কারো সঙ্গে এই মহিলার সুখের সংসার-জীবন ভাবতে গিয়ে হাসিই পেয়েছে।

জলপাইগুড়ি ছেড়ে এখানে আসতে পেরে অতসী ভেবেছিল তার অতীত নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না, সকলে তাকে কেবল অতসী গাঙ্গুলী বলেই জানবে।...কিন্তু এসব ব্যাপার বোধহয় গোপন থাকেই না। টিচাররা তো জেনেইছে, মেয়েদেরও জানতে। খুব সময় লাগেনি। হতে পারে এদের কারো-কারো সঙ্গে যুনিভার্সিটির কারো ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। হতে পারে ওই জাঁদরেল প্রিন্সিপালই পেয়ারের তিন বোর্ডার শিক্ষয়িত্রীকে বলে দিয়েছেন। না, মুখে তাকে কোনো টিচার এ নিয়ে একটি কথাও বলেনি। কিন্তু তাকে নিয়ে কথা আর কানাকানি যে হয় এটা খুব ভালোই বুঝতে পারে।...ঘুরিয়ে। ফিরিয়ে সে সম্বন্ধে কিছু আভাস দেবার লৌকও একজন এই কটা মাসের মধ্যে জুটেছে। স্কুলে মোট পাঁচজন পুরুষ টিচার আছে। তিনজনই সায়েন্স গ্রুপের, একজন জিওগ্রাফি টিচার, আর একজন অপেক্ষাকৃত কম

বয়সের আর্ট বা ড্রইং টিচার অমরেশ ঘোষ। বোর্ডার টিচারদের মুখে অতসী জেনেছে স্কুল কমিটির একটি বিশিষ্ট মুরুব্বির জোরে বছর তিনেক আগে অমরেশ ঘোষের এখানে চাকরি হয়েছে। বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে বয়েস। অবিবাহিত।

অতসীর এখন সাতাশ চলছে, সতের বছর বয়েস থেকে পুরুষের চোখের স্তুতি দেখে অভ্যস্ত, চিনে অভ্যস্ত। অতসী হলপ করে বলতে পারে সে এই স্কুলে আসার পনেরো দিনের মধ্যে ওই ভদ্রলোক তার প্রেমে পড়ে গেছে। আর মাস তিনেকের মধ্যে তো আপনারজনের মতো আচরণ তার। এখন স্কুলেই দুচারটে কথাবার্তা বলার ফাঁক খোঁজে। মাঝে-সাজে অতসী বিকেলের দিকে একটু হাঁটতে বা বেড়াতে বেরোয়। কিছুটা নিরিবিলিতে বেড়ানোর একটাই জায়গা। মহানন্দার দিকে গেলে তার সঙ্গে দেখা আর কথা হবেই। না গেলে অনুযোগ, যে একঘেয়ে জীবন আমাদের, হাঁটা চলার অভ্যাসটুকু ছাড়বেন না, শরীর মন দুই-ই ভালো থাকে, কিন্তু আপনি একদিন আসেন তো পাঁচ দিন আসেন না।

অতসী হাসে, যতটুকু সম্ভব সদ্ভাব রেখেই চলে। তাকে নিয়ে টিচারস রুমে আলোচনা হয় বলে ভদ্রলোক বিরক্তি প্রকাশ করে এবং বেশির ভাগ কি নিয়ে আলোচনা হয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তা-ও প্রকাশ করে দেয়।

অস্বস্তি গিয়ে অতসীর বরং সুবিধেই হয়েছে। বাইরে বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পেরেছে। এর ওপর বোর্ডার টিচার তিনজনের মুখে প্রিন্সিপাল তার পড়ানোর প্রশংসা শুনে আর স্বচক্ষে ছাত্রীদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ মেলামেশার ফল দেখে আরো প্রসন্ন। ওই তিন টিচারের একজনকে বলেছিল, দ্য গার্ল হ্যাঁজ আ চার্মিং পারসোনালিটি অফ হার ওউন-ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার।

এরপর আর পরোয়া কাকে করে?

.

একে একে চার বছরে চার-চারটে ব্যাচ অতসী গাঙ্গুলির হাত দিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে বেরিয়ে গেল। প্রত্যেক ব্যাচের থেকে প্রত্যেক ব্যাচের ওপর অতসী গাঙ্গুলির হিসেবী আধিপত্য বিস্তার বেড়েই চলেছে। ব্যাচ বলতে সকলে নয়, অতসীর নিজস্ব বাছাই ব্যাচ, অন্য টিচারদের বিবেচনায় ওই দেমাকী টিচারের বিদ্রোহী ব্যাচ। তাদের চাপা আক্রোশ অতসী গাঙ্গুলি মেয়েগুলোর মগজ ধোলাই করে ছেড়ে দিচ্ছে। যে মেয়েরা মুখের দিকে চেয়ে কথা বলত না, তার সেই বাছাই মেয়েগুলো দেখতে দেখতে সেয়ানা হয়ে উঠছে, হেসে-হেসে তর্ক করে ভেবা-চ্যাকা খাওয়ার মতো মুখ করে প্রশ্ন করে, বুদ্ধিমতীর মতো তির্যক মন্তব্য করে, টিকা-টিপ্পনী কাটে।

যেমন, সোস্যাল সায়েন্সের বয়স্ক টিচার কি আলোচনা প্রসঙ্গে একজনের স্মরণীয় উক্তি কোট করেছিলেন, ম্যারেজ ইজ এ গ্রেট ইনস্টিটিউশন– অতসী গাঙ্গুলির এক সুশ্রী পেয়ারের ছাত্রীর আলতো মন্তব্য, মে বি, বাট হু ওয়ান্টস টু লিভ ইন অ্যান ইনস্টিটিউশান?

...ইংরেজি টেক্সটের এক গল্পে বর-কনের বিয়ের বর্ণনা ছিল। দেখতে সুশ্রী একটি ভালো ছাত্রীর হঠাৎ প্রশ্ন, বিয়ের সময় কনের ধপধপে সাদা পোশাক কেন?

শিক্ষয়িত্রীর সাদাসিধে জবাব, সাদাটা শান্তি আর আনন্দের প্রতীক, মেয়েদের সেটা সব থেকে আনন্দের দিন।

তক্ষুণি প্রশ্ন, বরের গায়ে তাহলে কালো পোশাক কেন, তার কি তাহলে সেটা সব থেকে অশান্তি আর নিরানন্দের দিন?

নিজের বিয়ে-ভাঙা কপাল নিয়ে ওই রূপসী টিচার মেয়েগুলোর মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে না তো কি? কিছু বলারও উপায় নেই, খামখেয়ালি প্রিন্সিপালের দিনে-দিনে চোখের মণিটি হয়ে বসছে। খুশি হয়ে তার উঁচু ক্লাসের ইংরেজিরও অর্ধেক দিন এই একজনকেই পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বসে বসে লজেন্স চকোলেট খায়। আবার অবাকও হয়, অতসী গাঙ্গুলির বাছাই মেয়েগুলোর একটারও যদি পরীক্ষার ফল খারাপ হত, ইকনমিক্স-এ তো

সক্কলের ভালো নম্বর। অবাক কেবল ড্রইং মাস্টার অমরেশ ঘোষ হয় না, বলে আপনার হাতে পড়ে মেয়েগুলো সব সোনার টুকরো হয়ে উঠছে সেটা যদি এঁরা দেখতেন, কেবল হিংসের কথা–

অতসী গাঙ্গুলির ঠোঁটের ফাঁকে একটু মজা-ছোঁয়া হাসি লেগেই থাকে। প্রশ্রয়ের সুরে জিজ্ঞেস করে, কেন, কি বলেন...?

ও-টুকুতেই উৎসাহে টুপটুপু ভদ্রলোক, আর বলেন কেন, ভালো কারো সহ্য হয়, আপনি নাকি নিজেকে এডুকেশন ফ্যাক্টরি ভাবেন একটা, সিলেবাস বা নিয়ম টিয়মের ধার ধারেন না, কেবল পড়ানোর চমক দেখান, মেয়েগুলোকে আস্কারা দিয়ে আদরে বাদর করে তুলছেন।

এই চার বছরে ভদ্রলোকের দুর্বলতা মেয়েরাও টের পেয়ে গেছে, বিশেষ করে অতসী গাঙ্গুলির বাছাই ব্যাচের মেয়েরা। নিজেদের মধ্যে তারা হাসাহাসি কানাকানি করে, বলে, কেন বামন কি চাঁদের দিকে হাত বাড়ায় না–নইলে কথাটা এলো। কোত্থেকে?

...অতসী গাঙ্গুলির আত্মবিশ্বাস ওই কাঞ্চনজঙঘার চুড়োর মতো ঊর্ধ্বমুখী এখন। কাঁচা তাজা একটি মেয়েকে তার হাতে ছেড়ে দাও, তার দখলে থাকতে দাও, দেখবে বরাবরকার মতো সে তার হয়ে গেল। অতসী গাঙ্গুলি কল্পনায় তাই দেখছে, তাই বিশ্বাস করছে, অদূর ভবিষ্যতে তারা তার প্রতিশোধের এক-একখানা হাতিয়ার হয়ে উঠছে। আপন-আপন জগতে তারাও এক-একটি সম্রাজ্ঞী হয়ে উঠছে। কেবল যে মেয়েদের তার চাই তাদের মোটামুটি সুশ্রী হতে হবে, পুরুষের চোখ টানার মতো কিছু প্রসাদ গুণ (অতসী গাঙ্গুলির ভাষায় ন্যাচারাল ভাইটালিটি উইথ প্রসপেকটিভ ফেমিনাইন কারুভস) তাদের থাকতে হবে। এটুকু থাকলে রুচি-বোধ, প্রখর বিচার বিবেচনা-যুক্তিবোধ, সব থেকে বেশি স্বাধীনচেতা আত্মবোধের স্বাদ আফিম গিলিয়ে আপন আপন জগতে তাদের এক-একটি সম্রাজ্ঞী করে তোলা এখন কঠিন ভাবে না অতসী গাঙ্গুলি। এরাই তার প্রতিশোধের ভবিষ্যৎ হাতিয়ার।

তার বাছাই প্রথম ব্যাচের পাঁচটি মেয়ের মধ্যে বি. এ আর এম, এ পড়ার ফাঁকে চারটির বিয়ে হয়ে গেছল। তাদের মধ্যে দুজনের ডিভোর্স হয়ে গেছে, একজনের ডিভোর্স কেস কোর্টে ঝুলছে। চতুর্থজন তার স্বামীকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। পঞ্চমজন একের পর এক প্রত্যাশীদের বাতিল করে চলেছে। অতসীকে সে বলেছে তারও স্কুল টিচার হবার ইচ্ছে। হলে তো সোনায় সোহাগা। একবার যারা তার কেনা হয়ে গেছে, সময় আর সুযোগ হলেই তারা তাদের গুরুদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। অতএব অতসী সকলের সব খবর পায়।..দ্বিতীয় ব্যাচের চারজনের মধ্যে বিয়ে হয়েছে দুজনের, একজনের ডিভোর্স কেস কোর্টে ঝুলছে, অন্যজন কোন এক বড় কোম্পানির রিসেপশনিস্ট-এর চাকরি জুটিয়ে স্বামীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে গেছে। বাকি দুজন প্রার্থীর আশায় ছাই ঢেলে চলেছে। তৃতীয় আর চতুর্থ ব্যাচের সাত আর ছয় তেরো জন এখনো অপেক্ষাকৃত নতুন। পুলকিত হবার মতো ঘটনা এখনো ঘটেনি বটে। কিন্তু যোগাযোগ কারো না কারো সঙ্গে হয়ই। যাকে দেখে, কথা-বার্তা শুনে হাসি-খুশির আত্মপ্রত্যয় লক্ষ্য করে অতসীর মনে হয় প্রত্যেকে তার নিজস্ব জগতের সম্রাজ্ঞটি হয়েই বসে আছে। তারা তাদের দিনের অপেক্ষায় আছে।

এবারের বাছাই আটটি মেয়ের ব্যাচের যে-মেয়েটি লিডার, তার ওপর অতসী গাঙ্গুলির চোখ আরো চার বছর আগে থেকে। ও মেয়ে যখন তার ছাত্রীই নয়, তখন থেকে। এখন বদ্ধ বিশ্বাস তার এতদিনের সব বাছাই মেয়েদের ওপর দিয়ে এই মেয়ে টেক্কা দেবে। দেবার মতো সমস্ত গুণই তার মধ্যে দেখেছে। মনে মনে অতসী গাঙ্গুলি তাকে বুকে আগলে রেখেছে।

...চার বছর আগের সেই কৌতুক প্রহসনটুকু ভোলার নয়। কোন টিচার অ্যাবসেন্ট থাকলে প্রিন্সিপালের হুকুম-মতো লিজার-আওয়ারের টিচার তার ক্লাস নিতে যায়। ক্লাস এইটের ম্যাথস টিচার অনুপস্থিত। অতসী গাঙ্গুলি তার ক্লাস নিতে ঢুকেছিল। ছাত্রী না হলেও সব ক্লাসের মেয়েরাই তাকে দেখলে খুশি হয়।

মেয়েদের ফ্র্যাকশন জ্ঞান দেখার জন্য অতসী ছোট্ট একটু বুদ্ধির অঙ্ক দিয়েছিল। একটা ফেন্স মানে বেড়ার মধ্যে পনেরোটা ভেড়া আছে, আর

তাদের জন্য তিরিশ দিনের খাবার মজুত আছে। কিন্তু একটা ভেড়া ফেন্স টপকে পালিয়ে গেল। তাহলে বাকি চৌদ্দটা ভেড়ার ওই মোট খাবারে আরো কতদিন চলবে?

প্রশ্ন শুনে অনেক মেয়েরই ধাঁধা লেগে গেল। অনেকেই কলম নিয়ে খাতার ওপর ঝুকল। কোণের বেঞ্চের একটি মেয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। ভারী সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে, মুখে আর চোখে দুষ্টু-দুষ্টু মিষ্টি-মিষ্টি হাসে, এখনই বেশ লম্বা আর। সুডৌল স্বাস্থ্য, এক মাথা ঝাকড়া কোকড়া চুল। ছাই রংয়ের ওপর টকটকে লাল বর্ডার দেওয়া স্কুল ড্রেসে চমৎকার মানিয়েছে।

অতুসী গাঙ্গুলি জিজ্ঞেস করল, হয়েছে?

মাথা নাড়ল, হয়নি। তার পরেই প্রশ্ন শুনে অবাক।-ম্যাডাম, যে-ভেড়াটা ফেন্স টপকে পালালো সেটা কি পালের গোদা ভেড়া?

অতসী গাঙ্গুলি হাঁ কয়েক পলক।–তার সঙ্গে অঙ্কের কি সম্পর্ক?

–গোদা ভেড়া হলে তিরিশ দিনের খাবারই পড়ে থাকবে, বাকি চৌদ্দটা ভেড়াই ওটার পেছু পেছু ফেন্স টপকে পালাবে।

অতসী গাঙ্গুলি হেসে সারা, মেয়েরা আরো বেশি। হাসি থামতে বলল, আচ্ছা। গোদা ভেড়া নয় ধরে নিয়েই করো।

মেয়ে জবাব দিল-এর আর করার কি আছে, একটা ভেড়ার দুদিনের খাবার চৌদ্দটা ভেড়া খাবে–এর একটার ভাগে ওয়ান-সেভেনথ পড়বে, তাহলে টু ওয়ান সেভেনথ ডে চলবে।

বসে পড়ল। অতসী গাঙ্গুলির চোখে মুখে ঠোঁটে হাসি। হুকুম করল, দাঁড়াও।

তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালো।

তোমার নাম কি?

–নূপুর সরকার।

-কংগ্রাচুলেশনস্, তোমাকে আমার মনে থাকবে। অন্য কয়েকটি মেয়ে বলে উঠল, ও ব্রাবর আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল ম্যাডাম।

অতসী গাঙ্গুলি মনে রেখেছে। পর পর দুবছর তাকে ফার্স্ট প্রাইজ নিতে দেখেছে। সঙ্গে ইংরেজির আরো অনেক প্রাইজ নিতে দেখেছে। ক্লাস টেনে উঠে তার ছাত্রী হয়েছে। অতসী গাঙ্গুলি ইংরেজি এস এ-কম্পোজিশন ক্লাস নেয়, প্রিন্সিপাল না এলে ইংরেজি টেক্সটও পড়াতে হয়। প্রিন্সিপালের থেকে মেয়েরা তার ক্লাসেই। বেশি মজা পায়। নূপুর সরকার তখনো অতসী গাঙ্গুলির বাছাই ব্যাচের কেউ নয়, বাছাই ব্যাচ সে ঘেঁকে তোলে এগারো আর বারো ক্লাসের মেয়েদের থেকে। কিন্তু এই একটি মেয়ের প্রতি আগে থাকতেই ষোল আনা মনোযোগ তার। শুধু চেহারাপ দেখার মতো হয়ে উঠেছে তা-ই নয়, দুষ্টুমিও বাড়ছে। এর ওপর তার সুন্দর ইংরেজি লেখা।

গেল সপ্তাহে এসএ লিখতে দিয়েছিল, এ পুওর গার্লস কনস্ট্রাকটিভ ফিউচার প্ল্যান। এ-রকম উদ্ভট বিষয় নিয়ে লিখতে মেয়েরা মজা পায়। যে যতটা পারে বুদ্ধি ফলাতে চেষ্টা করে। অতসী গাঙ্গুলি এতদিনে জানে নূপুর সরকার এখানকার একজন নামী ডাক্তারের মেয়ে, তার দাদাও ডাক্তার। কিন্তু গরীব মেয়ের ফিউচার প্ল্যান রচনায় কোনো মেয়েই তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। সুন্দর লিখেছে।

.

পরের সপ্তাহে এর উল্টো রচনা লিখতে দিল সকলকে। ধরো তোমাদের প্রত্যেকের কাছে দশ লক্ষ করে টাকা আছে, এবারে যার যার কনস্ট্রাকটিভ ফিউচার প্ল্যান লেখ।

সবাই দ্বিগুণ মজা পেয়ে লিখতে বসে গেল। একটু বাদে অতসী গাঙ্গুলির চোখ গেল, নুপূর সরকারের দিকে। সে লিখছে না, চুপচাপ বসে আছে।

–কি হল, ভাবছ?

নূপুর মাথা নাড়ল, ভাবছে না।

–তাহলে লিখছ না কেন?

জবাবে সেই দুষ্টু-দুষ্টু মিষ্টি-মিষ্টি হাসি। বলল, দশ লক্ষ টাকা থাকলে আমি কিছুই করব না। এমনি চুপচাপ বসে থাকব।

এই মেয়েকে নিয়ে অতসী গাঙ্গুলি কি করে, কোথায় রাখে? হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে সব মেয়েকেই বলল, থাক বাপু থাক, আমার ঘাট হয়েছে, কাউকেই আর এই এস্এ লিখতে হবে না।

সেকেন্ডারি পরীক্ষায় আরো দশ পনেরোটা নম্বর বেশি পেলে নূপুর সরকার স্কলারশিপ পেতে পারত। ক্লাস ইলেভেনে এসে নূপুর আর আরো সাতজন তার হাতের মুঠোয়। এদের সকলকে উদ্যোগী হয়ে সে ইকনমিক্সএ টেনে এনেছে। তাতে বাছাই ব্যাচের অবধারিত লিডার নূপুর সরকার। লিডার কাউকে করতে হয় না, ব্যাচের সব থেকে চৌকস মেয়েটি লিডার আপনি হয়ে বসে। এই লিডার বলতে যার পরামর্শ আর বুদ্ধি নিয়ে ব্যাচের অন্যরা চলে ফেরে ওঠে বসে, গুরুদেবীর ভাব-ভাবনা আয়নার মতো দেখতে পায়।

ক্লাস ইলেভেনে নূপুর ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। দেখা-মাত্র অতসী গাঙ্গুলির মনে হয়েছে কিশোরীর সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে চট করে মেয়েটা যৌবনের সিংহাসনে দিব্যাঙ্গনার মতো বসে গেল।

তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে অভিনন্দন জানালো কংগ্রাচুলেশন!

-থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।

পড়াশুনার মেজাজ আনতে গিয়ে সকলের উদ্দেশে অতসীর প্রশ্ন, আচ্ছা, ইকনমি বলতে তোমরা কে কি বোঝো বলো তো? নূপুর আগে বলো–

উঠে দাঁড়ালো। অতসী গাঙ্গুলি পুরুষের চোখ দিয়ে দেখছে ওকে, আর ভিতরটা ততো খুশি হয়ে উঠছে। এখন তো ছেনিখোন্তা মাল-মশলা সব তার হাতে, যাবে কোথায়!

নূপুর একটু ভেবে জবাব দিল, ইকনমি হল খরচ করার এমন একটা আর্ট, যাতে কোনো মজা নেই।

অতসী গাঙ্গুলি জোরেই হেসে উঠল।–আমার কাছে ফার্স্ট ক্লাস নম্বর পেলে, পরীক্ষার খাতায় গোল্লা।

নূপুর হাসতে হাসতে বসে পড়ল।

..দু বছরের মগজ ধোলাইয়ের ফাঁকে এই মেয়ে এমনি হাসির জবাব অনেক দিয়েছে।

প্রশ্ন : কমিউনিস্ট আর ক্যাপিটালিস্টের মধ্যে তফাৎটা কি চার-চারে আট লাইনের মধ্যে লেখ।

নূপুর সরকার দুলাইনের মধ্যে লিখেছে। কমিউনিস্ট বলবে এত কারো থাকা উচিত নয়। ক্যাপিটালিস্ট বলবে এতটা অন্তত সকলেরই থাকা উচিত।

প্রশ্ন : এ-দেশে প্রোটেকটিভ ফরেন হেল্প-এর চেহারাটা কেমন?

নূপুরের উত্তর : লাইক এ ফিমেল ড্রেস উইদাউট অবস্ট্রাকটিং দি ভিউ।

আর একটা তৎপর জবাব মনে পড়লে অতসী গাঙ্গুলি হেসে বাঁচে না। প্রঃ ছিল, ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেশনের কিছু ভালো উদাহরণ দাও।

মেয়েরা লিখতে শুরু করে দিয়েছে। কোণের বেঞ্চ থেকে নূপুর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। দেহের ছাঁদ বদলেছে, কিন্তু চোখে আর ঠোঁটে সেই দুষ্টু-মিষ্টি হাসি লেগেই আছে।–একটা খুব রিয়েল আর ওরিজিন্যাল এগজাম্পল দেব ম্যাডাম?

–ও শিওর?

–আমার বউদি খরচের সতেরো ফিরিস্তি দিয়ে যে-টাকাটা আদায় করে নেয়, সেটা হল ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন। আর দাদা ঘুমিয়ে পড়লে যে টাকাটা তার পকেট থেকে হাতিয়ে নেয়, সেটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন।

এই উদাহরণ অতসী গাঙ্গুলির চিরদিন মনে থাকবে।

এ-ব্যাচেরও বারো ক্লাসের পরীক্ষা এসে গেল। মেয়েরা পড়াশুনায় ব্যস্ত। অতসী গাঙ্গুলিও তার বাছাই ব্যাচকে যতটা পারে এগিয়ে দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এ-বছরের মত তার মগজ ধোলাইয়ের পর্ব শেষ। সে পরিতুষ্ট, পরিতৃপ্ত। কেবল খেদ, নূপুর সরকারের মতো আবার একটি গড়ে তোলার মতো লিডার কবে পাবে।

এর মধ্যে আর্ট টিচার অমরেশ ঘোষ মুখখানা বেজার করে বলল, আপনার এবারের ব্যাচের ওই নূপুর সরকার মেয়েটি এত মিষ্টি এত ভালো, কিন্তু বেজায় ফাজিল। আমি তো হঠাৎ বুঝতেই পারিনি কি বলছে!

অতসী গাঙ্গুলি নূপুরের নাম শুনেই সচকিত একটু।–কেন, কি বলেছে?

–স্কুল থেকে কাল বাড়ি যাবার পথে রাস্তায় দেখা হতে আমাকে বলল, একটু নতুন কিছু আঁকুন না সার? কি-রকম জিজ্ঞেস করতে বলল, যেমন ধরুন, উমা নয়, শিব উমার জন্য তপস্যায় বসেছে গোছের…।

অতসী গাঙ্গুলি মনে মনে হেসে অস্থির। এ-রকম কথা নূপুর বলবে না তো কে বলবে। পরে ওর সঙ্গে দেখা হতে ছদ্ম কোপে চোখ পাকিয়েছে, এই মেয়ে আর্ট টিচার অমরেশবাবুকে কি বলেছিস?

ক্লাসের বাইরে নূপুর সরকারের এই ব্যাচটাকে তুমি ছেড়ে তুই বলা শুরু করেছিল। আর এই ব্যাচের মেয়েরাও বাইরে তাকে ম্যাডামের বদলে দিদি বলে। অতসীদি।

পরীক্ষা হয়ে গেল। বিদায়ের দিন এলো। অতসী গাঙ্গুলি প্রত্যেক ব্যাচকে বলে, নূপুর সরকারের হাত ধরে এই ব্যাচকেও তাই বলল।–মনে রেখো,

ভালো যদি কিছু করে থাকি তোমাদের লয়েলটিটুকুই কেবল আমার প্রাপ্য, আর কিছু চাই না।

.

অতসী গাঙ্গুলির বাছাই ব্যাচের সব মেয়েরাই য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকে ইকনমিক্স অনার্স পড়ে। এই ব্যাচে ব্যতিক্রম হল, নূপুর সরকার, ইংরেজি অনার্স নিয়ে ভর্তি হল। অতসী গাঙ্গুলি এই মেয়ের বেলায় সেটাই স্বাভাবিক ভেবেছে। এটাই ওর সব থেকে প্রিয় সাবজেক্ট।

মনে মনে ভাবল, এটা মন্দ হল না, একজনের সম্পর্কে টাটকা খবর কিছু কিছু পাওয়া যাবে।

এখন ওই প্রিয় ছাত্রীর বাড়িতে যাতায়াতও সহজ হয়ে গেছে অতসী গাঙ্গুলির। ফাঁক পেলে নূপুরও বোর্ডিং-এ এসে তার সঙ্গে গল্প করে, চা-চপ-কাটলেট রসগোল্লা সন্দেশ খেয়ে যায়।

ঠোঁট টিপে হেসে অতসী গাঙ্গুলি জিজ্ঞেস করে, তোদের ডক্টর ঘোষাল কেমন পড়াচ্ছে?

প্রায় দুবছর আগে সমর ঘোষালের ডক্টরেট হবার খবর অতসী ঠিকই রাখে।

–খুব ভালো, তবে বেজায় গম্ভীর আর সীরিয়াস। তার প্রসঙ্গ কেন নূপুরও জানে।

–সেটা বরদাস্ত করছিস নাকি তুইও! চোখে মুখে মজার হাসি।–এতদিন আমার কাছে কি শিখলি তাহলে?...এক কাজ করতে পারিস, মেয়েরা স্পেশাল সাহায্যের জন্য ছুটির দিনে তার বাড়িতে পড়তে আসত, গাম্ভীর্য আর সীরিয়াসনেস খাঁটি কি নকল বোঝার জন্য তুইও এ-সুযোগটা নিতে পারিস। ৩৭৪

নূপুর হেসেছে কেবল, জবাব দেয়নি।

বি এ ফাইনালের ছমাস আগে একদিন এসে খবর দিয়েছে, কি-যে মুশকিল হল, পরীক্ষাটার মুখে ডক্টর ঘোষাল এই য়ুনিভার্সিটি ছেড়ে কলকাতার না কোন য়ুনিভার্সিটির রিডার হয়ে চলে গেলেন।

অতসী গাঙ্গুলির মুখখানা তেতে উঠল।–যাবে না তো কি, নিজের স্বার্থ ছেড়ে কে আর আমার মতো তোদের জন্য প্রাণটা দিয়ে পড়ে থাকে।

ফাইনাল পরীক্ষার খবর বেরুতে নূপুর এসে জানালো জার্নালিজম নিয়ে এম-এ পড়ার জন্য সে কলকাতায় চলল। অতসী গাঙ্গুলি প্রথমে ভাবল, ওর মাথায় আসে। পরে মনে হল, এই সাবজেক্টই ওর পক্ষে ভালো, এ-লাইনে থাকলে গর্তের অনেক সাপ টেনে বার করতে পারবে, অনেকের মুখোশ ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিতে পারবে।

.

আরো বছর আড়াই কেটে গেছে। অতসী স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে। বেয়ারা তার হাতে একটা ডাকের খাম দিয়ে গেল। খামের লেখাটা চেনা-চেনা মনে হল। খাম খুলে দেখল তাই। নিচে নূপুরের নাম।

শ্রীচরণেষু,

অতসীদি, আশা করি আমাকে ভুলে যাননি। গত আড়াইটা বছর দ্রুত তালে কেটে গেল। জেনে খুশি হবেন, এম এ জার্নালিজম এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি। তার আগে থেকে একটা কাগজে শিক্ষানবিসি করছিলাম, এখন সেই কাগজের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছি।

আমাদের ব্যাচকে বিদায় দেবার কালে আপনি বলেছিলেন লয়েলটিটুকুই আপনার প্রাপ্য, আর কিছু চান না। অন্যদের কথা জানি না, আমি ভূলিনি। এখানে পড়ার সময় ইনভেসটিগেটিভ জার্নালিজম, বিষয়টির ওপর আমি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম। আপনার প্রতি লয়েলটির কথা ভেবে আমার প্রথম অনুসন্ধানের বিষয় ছিল বিবাহ বিচ্ছেদ। অন্য দেশ বা রাজ্যের নয়, কেবল এই বাংলার। ভেবেছিলাম কাজটা কঠিন হবে না, কিন্তু শুরু করে দেখি আমি অথৈ জলে। হাজার-হাজার কেস-এর ফয়সালা হয়ে গেছে,

হাজার-হাজার পেনডিং কেস লাখের দিকে গড়াতে চলেছে। দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিদেশের মতো অদূর ভবিষ্যতে এখানেও ডিভোর্স কোর্ট গজাবে। কাগজের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে কেস স্টাডি করার কিছু সুবিধে হয়েছে। ডিভোর্স ছাড়া গতি নেই এমন বেদনাকরুণ ঘটনা অবশ্যই অনেক পেয়েছি। কিন্তু সামগ্রিক সংখ্যার তুলনায় নগণ্য। শতেকে নব্বইটির কাছাকাছি দেখলাম বিচ্ছেদের মূলে ব্যক্তিত্বের সংঘাত পারসোনালিটি ক্ল্যাশ। কত তুচ্ছ কারণে এই সংঘাত স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে বিচ্ছেদের প্রাচীর তুলে দিতে পারে দেখে আমি তাজ্জব। পরস্পরের সদয় বোঝা-পড়ার চেষ্টা, একটু অ্যাডজাস্টমেন্টের চেষ্টা এমন নির্দয়ভাবে অনুপস্থিত হয় কি করে? এর নাম ব্যক্তিত্ব না সুপারইগো?–আত্মকেন্দ্রিক অহংকার? যাক, এর পরে বেছে-বেছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে নেমেছিলাম। প্রথমেই কার কাছে গেছি আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন–ডক্টর সমর ঘোষালের কাছে। কলকাতায় এসে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। তার সাহায্য সর্বদাই পেয়েছি। এব্যাপারে দেখলাম একমাত্র তিনিই অকপট হতে পেরেছেন, নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করেছেন। অন্য স্ত্রী পুরুষদের বেশিরভাগ ডিভোর্সের পরেও আক্রোশ নিয়ে বসে আছেন, পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছেন।

...এরপর আরো একটু সমাচার আছে। আসছে সপ্তাহে ডক্টর ঘোষালের সঙ্গে আমার বিয়ে। পারস্পরিক বোঝাপড়া বা অ্যাডজাস্টমেন্ট সম্ভব কিনা সেটা ষোল আনা যাচাই করে দেখার জন্য একজন ভুক্তভোগীকেই জীবনে টেনে নিলাম। লয়েলটির এর থেকে বড় প্রমাণ আপনার সামনে আর কি রাখতে পারি? অবশ্য আপনার তুলনায় আমার একটু সুবিধেও আছে। বয়সে তিনি আমার থেকে দশ-এগারো বছরের বড়, আর স্নেহ নিম্নগামী, চেষ্টা সত্ত্বেও আমার দিক থেকে বোঝাপড়ার ত্রুটি দেখলে স্নেহের দায়ে তিনি উপেক্ষা করবেন বা শুধরে দেবেন এই বিশ্বাস আর জোরও আমার মনে আছে।...এর মধ্যেও আপনার কথা আমি ভেবেছি। আপনার মানসিকতার অনাপোস জয় যদি এখনো চান, মনে হয় সে-সময়ও একেবারে ফুরিয়ে যায়নি, এখনো আপনি আমাদের আর্ট টিচার অমরেশ ঘোষের দিকে ফিরে তাকাতে পারেন। প্রণতা, আপনার। স্নেহের নূপুর।

ক্রোধে আর আক্রোশে অতসী গাঙ্গুলি কাঁপছে থরথর করে। সেই ক্রোধ আর আক্রোশ চোখ দিয়ে ভেঙে পড়তে শয্যায় আছড়ে পড়ল। অনেক-অনেকক্ষণ একভাবে পড়ে রইলো।...প্রথম ঘণ্টার ক্লাস মিস হয়ে গেছে। উঠল। মুখ-হাত ধুয়ে এসে সামান্য কুঁচকে যাওয়া শাড়িটা বদলে আরো একটু চকচকে শাড়ি পরল। অভ্যস্ত তৎপরতায়। আবার প্রসাধন সেরে নিল। আয়নায় দাঁড়িয়ে রক্তিম দুই কানে, নাকের ডগায়, দুচোখের কোণে আর একটু পাউডার বোলালো। ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে করিডোর। ধরে দ্রুত সিঁড়ির দিকে চলল। দ্বিতীয় ঘণ্টার ক্লাস না, মিস্ হয়।

দীপ জ্বেলে যাই

মেন্টাল অবজারভেটরি। ছবির মত ঝকঝক করছে বাড়িটা। সামনে-পিছনে বাগান। দুদিকের রাস্তাগুলো যেন কালো বার্ণিশ করা। ভিতরে জনা চল্লিশেক রোগী। রোগী বলা ঠিক হবে না। রোগিণীও আছে চৌদ্দ-পনের জন। আলাদা আলাদা ঘর। মক্তি বিকৃতির কারণ সকলের এক নয়। চিকিৎসা ব্যবস্থাও বিভিন্ন। ..

অদূরে নার্স কোয়াটার্স। বাঙ্গালী আর ফিরিঙ্গী মেয়ের জগা-খিচুড়ি। একে অপরের ইয়ারকি-ফাজলামোগুলো মক্স করে। দিশি মেয়ে মেম-সাহেবের বাংলা নকল করে মুখ ভেঙায়। মেমসাহেব দিশি মেয়ের পিঠে কিল বসিয়ে ছুটে পালায়। শিথিল অবকাশটুকু হাসি-ঠাট্টায় ভরাট থাকে।

তবু এরই মধ্যে একজনকে যেন সমীহ করে চলে ওরা। বাইরে নয়, মনে মনে। ঈর্ষা বলা যেত, কিন্তু সে কথা ভাবতে নিজেরাই লজ্জা পাবে। রেখা মিত্র, সিষ্টার ইনচার্জ। কর্তামো করে এ অপবাদ তার শত্রুও দেবে না। আগের বুড়ি ইনচার্জ যা। ছিল, বাবা। নাকের জলে চোখের জলে এক করে ছাড়ত। এ বরং ভালো, দরকার হলে উল্টে তড়পে আসা যায়। তাছাড়া ছিল তো ওদেরই একজন, এখন না হয় মাথার ওপর উঠে বসেছে। চ্যারিটি মিশনের মেয়ে না হলে এতদিনে বাড়ি-গাড়িওয়ালা ঘরে বরে ভরে যেত কোন কালে এ সকলেই উপলব্ধি করতে পারে। সারা দেহে রূপ আর স্বাস্থ্য যেন একসঙ্গে মাথা খুঁড়ছে। কিন্তু এ নিয়েও কটাক্ষ করে না কেউ। কারণ

নিজেই সে নিজেকে আগলে রাখতে ব্যস্ত। প্রাচুর্যের আভাসটুকু অবশ্য ঢেকে রাখা সম্ভব নয়।

হাসপাতালের বড়কর্তা মনস্তাত্ত্বিক কর্ণেল পাকড়াশী। নামের মত মানুষটিও গুরুগম্ভীর। কাছে এলেই বুকের ভেতরটা গুরগুর করে ওঠে। নার্স, এ্যাসিসট্যান্ট সকলেরই। তারই দুদুটো উদ্ভট এক্সপেরিমেন্ট সফল করেছে রেখা মিত্র। নির্দেশ মত। নিখুঁত অভিনয় করেছে। এতটুকু ভুল হয়নি, এতটুকু ত্রুটি ঘটেনি। এক বছরের মধ্যে পর পর দুজন মৃত্যুপথযাত্রী বিকৃত-মস্তিষ্ক মানুষ সুস্থ নিরাময় হয়ে ঘরে ফিরে গেল। কর্ণেল পাকড়াশী লিপিবদ্ধ করছেন তাঁর গবেষণার ইতিবৃত্ত। হয়ত রেখা মিত্ররও নাম থাকবে তাতে। কিন্তু ইতিমধ্যে তৃতীয় রোগীর আবির্ভাব ঘটল। একই রোগ, একই কারণে মস্তিষ্ক-বিকৃতি। কর্ণেলের আগ্রহ বাড়ে। রেখা মিত্রর ডাক পড়ে তৃতীয় বারও। প্রথম সফলতার পরে সহকর্মিণীদের মনে হয়েছে মেয়েটা যেন বদলেছে একটু। দ্বিতীয় বারের পরিবর্তন আরো সুস্পষ্ট। কথা বলা কমিয়েছে। অকারণ হাসিখুশীটুকুও। চলনে বলনে কেমন যেন একটু বিচ্ছিন্নতা। ফিরিঙ্গি মেয়েরা সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে তাকে। স্বজাতীয়দের মধ্যে চাপা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে ফেলে কেউ কেউ, যশস্বিনী হয়ে পড়েছেন, প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে, মাটিতে পা পড়বে কেন!

কর্তব্যবোধে আর একজন হয়ত থামাতে চেষ্টা করে তাকে, এই, শুনলে দেবেখন।

-শুনুক, কর্ণেলের পকেট-ঘড়ি হয়ে থাকলে অমন বরাত সকলেরই খুলত।

-যাঃ, মেয়ের মত মানুষ করেছে, কি আবোল-তাবোল বকিস? বিরক্তি প্রকাশ করেছিল নার্স মহলের দ্বিতীয় তারকা বীণা সরকার। শিক্ষা এবং রুচিজ্ঞান আছে। বুড়ি সিস্টার-ইন-চার্জের পর সেই হতে পারত সর্বেসর্বা। কিন্তু দুবছর আগে কোথা থেকে হুট করে বদলি হয়ে এলেন কর্ণেল, সঙ্গে এল রেখা মিত্র। তার দিন গেল।

এরই মুখ থেকে প্রতিবাদ শুনে পূর্বোক্ত শুশ্রূষাকারিণী চুপসে গেল যেন। প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল, সেকথা কে বলেছে, আমি বলছিলাম অমন জয়ঢাক বাজাবারও কোন মানে হয় না। আসলে পুরুষগুলিই সব ভেড়া-মার্কা, রূপসীর মুখে দুটো নকল ভালবাসার কথা শুনেই গলে জল হয়ে গেল। পাগল না হাতী।

কিন্তু এও যে রাগের কথা সকলেই উপলব্ধি করতে পারে। দ্বিতীয় রোগীটির ভার কর্ণেল প্রথমে বীণা সরকারকেই দিয়েছিলেন। রেখা মিত্রর মতই সুনাম অর্জনের আশায় প্রাণপণ চেষ্টা করেছে কর্ণেলের নির্দেশ কলের মত মেনে চলতে। অভিনয়ে এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না তারও। তবু পারল না। তাকে সরিয়ে কর্ণেল রেখাকে নিয়ে এলেন আবার। এখনো ভেবে পায় না, সেই মুমূর্ষ উন্মাদকেও সে কি করে ছমাসের মধ্যে একটু একটু করে সম্পূর্ণ নীরোগ করে তুলল।

দুর্নিবার কৌতূহলে ঠাট্টার ছলেই সে রেখাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি করে কি করলি রে?

নিজের ঘরের চৌকাঠের কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল রেখা মিত্র। প্রশ্ন শুনে তার চোখে চোখ রেখে নীরবে চেয়েছিল কিছুক্ষণ। পরে তেমনি হালকা জবাবই দিয়েছে, গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, ভালবাসি প্রিয়তম, আগের সব কথা ভোলো–

বীণা হেসে ফেলেছিল।–ভুলল?

শব্দ করে হেসে উঠেছিল রেখা মিত্রও।ভুললই তো।

বীণার মনে হয়েছে, ইচ্ছে করেই সে তার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল, যশের ডালি ভবিষ্যতেও আর কাউকে ভাগ করে দিতে রাজি নয় বোধ হয়। ভু কুঁচকে বলল, তা এমন অভিনয় করিস যদি থিয়েটার বায়স্কোপে ঢুকে পড় গে যা না, হাসপাতালে পচে মরছিস কেন?

–পারি। হলিউড থেকে ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি গেলে তোর ছোট ডাক্তার হার্ট ফেল করবে, সেজন্যেই যেতে পারছি না।

হাসতে হাসতে মুখের ওপরেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। বীণা সরকার স্তব্ধ। ...ছোট ডাক্তার নিখিল গুহ। রেখা মিত্র না এলে এতদিনে সত্যিই একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত। সে জ্বালা আছেই। কিন্তু তবু রাগতে পারেনি। কারণ, আজ পর্যন্ত ছোট ডাক্তার এই মেয়েটির কাছ থেকে শুধু নীরস অবহেলা ছাড়া আর কিছু পায়নি। কর্ণেলের হাতের মেয়ে না হলে এতদিন এখানে আর চাকরী করতে হত না ওকে।

কিন্তু পুরানো কথা থাক। তিন নম্বর রোগী এসেছে। তৃতীয় বার ডাক পড়েছে। রেখা মিত্রর। নার্স কোয়ার্টারের আবহাওয়া চঞ্চল। কর্ণেলের তলব শুনলে পড়িমরি করে ছুটে যাওয়াই রীতি। কিন্তু ওর ঘরের দরজা বন্ধ এখনো। করছে কী? ঘুমুচ্ছে? না সাজছে?

কিন্তু রেখা মিত্র কিছুই করছে না। শিথিল আলস্যে স্রেফ শুয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে। বুকের ওপরের বইখানা দেখলেও সহকর্মিণীরা হাঁ করে ফেলত হয়ত। বিবেকানন্দের কর্মযোগ। তুলে নিল। উল্টে-পাল্টে দেখল একবার। হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ঘরের কোণে আলনার নীচে গিয়ে আশ্রয় নিল সেটা। উঠে বসল পা ঝুলিয়ে। পরনের বেশ-বাসের দিকে তাকালো একবার। চলে যাবে। ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। চোখের সামনে ভাসছে দুটি মুখ। সমরেশ চক্রবর্তী আর মাধব সোম। সুপুরুষ দুজনেই। কিন্তু পাগল হলে কি বীভৎসই না হয় মানুষ। প্রাণের জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে বলে গেছে। রেখা মিত্র নিজের মনেই হেসে উঠল।...তা থাকবে হয়ত।

আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। একটু প্রসাধন দরকার। বুড়ো কর্ণেল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে আবার। চোখ নয় ত, যেন দুখানা এক্স-রের কাঁচ। কিন্তু আয়নার দিকে চেয়ে চেয়ে আত্মবিস্মৃত তন্ময়তা নেমে এলো কেমন। চেয়েই আছে। দেখছে। কিন্তু কে দেখছে কাকে? কে রেখা মিত্র? ওই শুভশ্রী নারীমূর্তি? কি আছে ওতে।...রক্ত, মাংস, নীল নীল কতগুলো শিরা-

উপশিরা। গা ঘিন ঘিন করে উঠল। তারপর?...শুকনো, কঠিন, কুৎসিত কঙ্কাল একটা। শিউরে উঠল আবারও। তাহলে কে দেখছে? আর বাকি থাকল কী?

দরজার গায়ে শব্দ হল ঠক ঠক করে। বিষম চমকে উঠল সে। আবার বেয়ারা পাঠিয়েছে নিশ্চয়। দরজা না খুলেই জবাব দিল, বলো গিয়ে এক্ষুনি যাচ্ছি। বুড়ো দেবে দফা সেরে। চটপট এপ্রোন পরে নিয়ে হুডটা মাথায় চড়ালো। জুতো বদলাতে গিয়ে আলনার নীচে কর্মযোগের দুর্দশা দেখে জিভ কাটল তিন আঙুল। তুলে নিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে একবার কপালে চুঁইয়ে ড্রয়ারে রেখে দিল বইখানা।

নাকের ডগা থেকে চশমা কপালে তুলে দিলেন কর্ণেল।-বোসো। পেশেন্ট দেখেছ?

রেখা ঘাড় নাড়ল, দেখিনি।

–হাউ এ্যাবসার্ড। –এ থার্ড কনসিকিউটিভ সাকসেস উইল মেক ইউ এ ফিনিসড় এ্যাকট্রেস মাই ডিয়ার। হেসে কাজের কথায় এলেন, সেই কেস, সেইম ট্রিটমেন্ট। কিন্তু একটু গণ্ডগোল আছে।...নাটক নভেল কি সব লিখত টিকত। ইউ শুড বি মোর এলার্ট, এমনিতেই আধ পাগল এসব লোক। টাইপ-করা কেস-হিস্ট্রি বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে, দেখো।

কাগজগুলো নিয়ে রেখা চোখ বুলোতে লাগল। এক অক্ষরও পড়ল না। কারণ, এবারে আর রোগী ভালো হবে না সে জানে। আর কিই বা হবে পড়ে! নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বগ্রাসী শূন্যতার মাশুল দিচ্ছে সেই ইতিহাসই তো! তাকে নতুন করে রোগে ফেলতে হবে আবার। ভালবাসার রোগ। যে নারীর অমোঘ স্মৃতি মানুষটাকে দেউলে করেছে, বিকল করেছে, তার মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। কিছুদিনের জন্য তার মানসপটে অধিষ্ঠাত্রিণী হবে রেখা মিত্র। এটুকুই চিকিৎসা। তারপর এই নতুন রোগ আর কাঁচা মোহ ছাড়াবার কলাকৌশল ভালই জানেন মনোবিজ্ঞানী কর্ণেল। ছদ্ম-গাম্ভীর্যের আড়ালে রেখা হাসছে মনে মনে। বুড়োর সকল আশায় ছাই পড়বে এবার।

কিন্তু রেখা মিত্রর সঙ্কল্পে ছেদ পড়ল বোধ করি প্রথম দিনই। দোতলায় কোণের দিকে ঘর। কান পেতেও কোন সাড়াশব্দ পেল না। দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল। স্প্রীং-বসানো দরজা আপনি আবজে যায় আবার।

বাহুতে চোখ ঢেকে শুয়ে আছে লোকটি। আধ ময়লা, রোগা মুখে এক-আধটা বসন্তের দাগ। সুশ্রী বলা চলে না কোন রকমে। পায়ের শব্দে চোখের ওপর থেকে হাত সরালো সে। হাসল একটু, নমস্কার, বেশ ভালই আছি আমি।

আগের দুজন রোগীর কাছে যাওয়াটাও নিরাপদ ছিল না প্রথম প্রথম। চোখে চোখ রেখে রেখা দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। সে আবার বলল, আপনাদের এই জায়গাটা, ভালো, বেশ নিরিবিলি, কোন অসুবিধে হচ্ছে না আমার। চোখের ওপর হাত নেমে এলো, আচ্ছা, দরকার হলে খবর দেবখন।

রেখা এগিয়ে এসে রোগীর চার্ট দেখে নিল, ঠিক ঘরে এসেছে কি না। অমর। দত্ত…। ঠিকই আছে। রকিং চেয়ারটায় এসে বসল। আধ ঘণ্টা কেটে গেল, টু-শব্দটি নেই। স্থাণুর মত পড়ে আছে মানুষটা। তারপর এক সময় হাত সরে গেল আবার। সবিস্ময়ে তাকালো সে, কি আশ্চর্য। সেই থেকে বসে আছেন আপনি? মিথ্যে কষ্ট করছেন কেন, দরকার হলেই আমি ডাকবখন, আপনি যান।

বিস্মিত রেখাও কম হয়নি।–আপনি ভাবচেন কী?

অস্ফুট শব্দ করে হেসে উঠল সে।একটা লাইন কিছুতে মনে করতে পারছি। নে সেই থেকে। সব দিতে সব নিতে যে বাড়াল কমণ্ডলু দ্যুলোকে ভুলোকে…তার। পর ভুলে গেছি। রবি ঠাকুর চুরি করেছে।…চুরি ঠিক নয়, আগে ভাগেই লিখে বসে। আছে। নইলে আমি লিখতুম। কিন্তু তার পরের কথাগুলো…

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল রেখা মিত্র। হিরনেত্রে চেয়ে রইল।

–আপনার জানা আছে? নেই, না? সুলেখা কিন্তু ফস করে বলে দিত।

নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে চমকে উঠল নিজেই। বিহ্বল, বিমূঢ়। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। কঠোর কঠিন কতগুলো রেখা সুস্পষ্ট হল সারা মুখে। চোখের দৃষ্টি গেল বদলে। দুই চোখে আগুনের হল্কা। ঝুঁকে এলো সামনের দিকে।

–আপনি, আপনিও তো মেয়েছেলে?

রেখা চেয়ার ছেড়ে এক পা অগ্রসর হতেই সে গর্জে উঠল আবার।–দাঁড়ান। ওখানে। আমি জানতে চাই আপনি মেয়েছেলে কি না?

রেখা ঘাড় নাড়ল, মেয়েছেলেই বটে।

–যান আমার সুমুখ থেকে। আর কখনো আসবেন না। মেয়েদের আমি আর দেখতে চাই নে কোন কালে। কোন দিন না। এত বড় অভিশাপ আর নেই। দাঁড়িয়ে আছেন কি? যাবেন না? যান, যান, বলছি!

চোখে পলক পড়ে না রেখা মিত্রর। অদ্ভুত রূপান্তরটা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে। ঠক ঠক করে কাঁপছে মানুষটা। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।

দরজা খুলে রেখা বাইরে এসে দাঁড়াল। অমর দত্ত বিড় বিড় করে বকে চলেছে। তখনো। উত্তেজনা বাড়ছেই। একটা ইনজেকশান নিয়ে রেখা আবার ভিতরে এলো। কনুইয়ে ভর করে অমর দত্ত আধা-আধি উঠে বসল প্রায়।আবার এসেছ? সুলেখা পাঠিয়েছে, কেমন? তোমাদের ভয়-ডর নেই? আমার কলমের ডগায় কত বিষ জানো?

-জানি, শুয়ে পড়ুন।

–ফাস্ট, ইউ গেট আউট।

ইনজেকশান আর আরকের তুলোটা এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে করে রেখা। তার কাঁধে আচমকা ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে দিল। এরকম একটা সবল নিষ্ঠুরতার জন্য রোগীও প্রস্তুত ছিল না। হকচকিয়ে গেল কেমন।

ততক্ষণে তার সামনের বাহু উঠে এসেছে ওর শক্ত হাতের মুঠোয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ইনজেকশান শেষ।

…পাঁচ মিনিটও গেল না। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে রোগীর। তবু যতক্ষণ পারল চোখ টান করে সে দেখতে চেষ্টা করল এই নির্মম শুশ্রূষাকারিণীকে।

ইনজেকশান রেখে নীরবে অপেক্ষা করছিল রেখা। সে ঘুমিয়ে পড়তে কাছে। এসে দাঁড়াল। বিছানাটা অবিন্যস্ত হয়ে আছে। টান করে দিল। চুলগুলো কপালের ওপর দিয়ে চোখে এসে পড়েছে। সরিয়ে দিল। গায়ের চাদরটা টেনে দিল বুক পর্যন্ত। নিঃশব্দে চেয়ে রইল তার পর। ঘুমন্ত মুখেও বহু দিনের একটা ক্লিষ্ট যাতনা সুপরিস্ফুট যেন। লোকটা ভালো কি মন্দ সে কথা এক বারও মনে আসছে না তো! তাদেরই এক জনের জন্য এই মানুষের সকল বৃত্তি হারাতে বসেছে। হঠাৎ মনস্তাত্ত্বিক কর্ণেলের ওপর ক্ষেপে আগুন হয়ে গেল রেখা মিত্র। তার সকৌতুক কণ্ঠস্বর যেন গলানো সীসে ঢেলে দিতে লাগল কানে, এ থার্ড কনসিকিউটিভ সাকসেস…।

এর পরের দুতিন মাসের চিকিৎসা-পর্বে নতুন করে বর্ণনার কিছু নেই। এক নারীর স্মৃতি মনে এলেই অমর দত্ত চিৎকার-চেঁচামেচি করে ওঠে তেমনি, নিঃস্ব হিম শীতল জীবনের হাহাকারে জলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়। রেখা কখনো ঘর ছেড়ে চলে যায় তার কথা মত, কখনো বা উল্টে ধমকে ওঠে সুষ্ঠু অভিনেত্রীর মত, কখনো বা প্রণয়িনীর আকুলতায় কাছে এসে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। শেষের দিকে একটু পরিবর্তন যেন উপলব্ধি করতে পারে। তর্জন-গর্জন তেমনি আছে, কিন্তু বেশিক্ষণ সে অনুপস্থিত থাকলে অসহিষ্ণুত্তাও বাড়ে।

-এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

–বাইরে।

–কেন?

–আপনিই তো ঘর থেকে বার করে দিলেন।

–আপনি গেলেন কেন?

রেখা হেসে ফেলে, আচ্ছা, আর যাব না। কিন্তু আবারও তাকে যেতে হয়, আবারও আসতে হয়। তবু রেখা বোঝে, দিন বদলাবে। অনেক বদলাবে। কিন্তু বলে না কাউকে কিছু। কর্ণেলের নীরব প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। সহকর্মিণীদের কৌতূহলও জানবার। বিশেষ করে বীণা সরকার ছাড়বার পাত্রী নয়।

–নতুন নাগরটি কেমন?

–ভালো।

–তবু, নমুনাটা শুনিই না একটু?

–মর্কটের মত।

–আঁচড়ে কামড়ে দেয়?

–দেয়নি, দিতে পারে।

বীণা সরকার হেসে ওঠে, কিছুতে পোষ মানছে না বল?

হেসে টিপ্পনী কাটে রেখা মিত্রও, ছোট ডাক্তারকে নিয়ে পড় গে না, আমাকে নিয়ে কেন।

অমর দত্ত ভালো হবে। এবারও এই বিধিলিপি। আরও মাস দুই পরের সেই বিশেষ মুহূর্তটির অপেক্ষা শুধু। রেখা রকিং চেয়ারে বসে হাসছে মৃদু মৃদু। অল্প অল্প দুলছে চেয়ারটা। অমর দত্ত নির্নিমেষ নেত্রে তার দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখছে।

রেখা উঠে গায়ের এপ্রোনটা খুলে চেয়ারের কাঁধে রাখল। মাথার হুডটাও। খোঁপার আধখানা পিঠের ওপর ভেঙ্গে পড়ল। বসল আবার। রকিং চেয়ার সজোরে দুলে উঠল।

-কি হল?

–গরম লাগছিল।

–হাসছেন যে?

–এমনি।

–এমনি কেউ হাসে?

–তাহলে আপনাকে দেখে।

–আমি তো কুৎসিত দেখতে।

–ছিলেন, এখন মোটামুটি মন্দ নয়।

অমর দত্তও হাসতে লাগল। একটু বাদে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনি। আমার জন্য এতটা করেন কেন?

-কতটা করি?

–বলুন না শুনি?

-আপনি একজন এত বড় লেখক, আপনার জন্য করব না তো কার জন্য করব! কত লোক কত কিছু আশা করে আপনার কাছে।

হঠাৎ যেন একটা ঝাঁকুনি খেল অমর দত্ত। সমস্ত রক্ত যেন উবে গেল মুখ থেকে। নিঃসাড়, পাণ্ডুবর্ণ। আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, এ তো সুলেখার কথা! সুলেখা বলত। আমার মত লেখক নেই, আমার জন্য সব পারা যায়, সব করা যায়। এর পর তারই মত বলে বেড়াবেন তো, আমি গরীব, খেতে-

পরতে পাই নে ভালো করে, মুখে বসন্তের দাগ, পাগল-ছাগলের মত লিখি যা মনে আসে, দুরাশা দেখে হাসি পায়–বলবেন? বলবেন তো?

স্থির, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল রেখা। উঠে কাছে এলো।–সুলেখা এসব বলেছে?

-হা বলেছে, সর্বত্র বলেছে, হেসে আটখানা হয়ে বলেছে। আপনিও বলবেন, হাত বাড়ালেই বলবেন। আবার সে কাঁপতে সুরু করেছে, মুখে দুঃসহ যাতনার চিহ্ন।

কণ্ঠস্বর কান্নার মত শোনায় এবার।–আমি তো কোন অপরাধ করিনি। বুকের ভেতরটা জ্বলে-পুড়ে যেতে দেখলে আপনাদের এত আনন্দ হয় কেন? ভয়াবহ নিঃসঙ্গতায় হাড়-পাঁজর শুদু যখন ভেঙ্গে দুমড়ে একাকার হয়ে যায়, সে যাতনা বোঝেন? আকণ্ঠ পিপাসায় যখন...

আর কথা বেরুল না। বাহুতে মুখ ঢেকে ফেলল সে। রেখা আস্তে আস্তে হাতখানি সরিয়ে দিল আবার। এক পা মাটিতে রেখে শয্যায় ঠেস দিয়ে বসেছে। শুভ্র, নিটোল দুই হাতে মুখখানা ঘুরিয়ে দিল নিজের দিকে ঝুঁকে এলো আরো কাছে।

দু-চার মুহূর্তের নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়।

অমর দত্তর ঠোঁট দুটো আর একবার থর-থর করে কেঁপে উঠল শেষ বারের মত। তার পর এক বিস্মৃতিদায়িনী, স্পর্শের মধ্যে নিবিড় করে আশ্রয় পেল তারা। এত কালের হাড় কাঁপানো হিমশীতল অনুভূতিটা যেন নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে। উষ্ণ। ...নরম।...তন্দ্রার মত।...ঘুমের মত।...ঘুমিয়েই পড়ল।

পরের কটা দিনের তুচ্ছতা বাদ দেওয়া যাক। নির্দেশ মত তাকে নিয়ে বাইরে। বেড়ানো, সিনেমা দেখা, থিয়েটার দেখা।

রেখা তাগিদ দিল কর্ণেলকে, এর পরে মুশকিলে পড়ব, তাড়ান শীগগির।

কর্ণেল হাসেন, ইউ প্রেটি উইচ।

রেখা প্রতিবাদ করে, ফিনিল্ড এ্যাকট্রেস।

এর পর কদিন ধরে কর্ণেলের ঘরে বসে নিজের রোগজীর্ণ প্রতিচ্ছবিটি দেখেছে অমর দত্ত। বৈজ্ঞানিক রেকর্ডে নিজেরই দুই একটা পাগলামীর নমুনা শুনে শিউরে উঠেছে। আগের দুজন রোগীকে কি করে ভালো করেছে রেখা মিত্র তাও শুনল। সব শেষে, একই উপায়ে নিজের আরোগ্য লাভের ইতিবৃত্ত। নিপুণ মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ এবং সারগর্ভ উপদেশ শিরোধার্য করে গৃহপ্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করল যখন, তখন মনটাই শুধু ভারাক্রান্ত হয়ে আছে ক্লান্তিকর বোঝার মত। এ ছাড়া আর কোন উপসর্গ নেই।

রেখার প্রতীক্ষা করছিল। সে এলো।

–যাবার সময় হলো, এই জন্যেই ডেকেছিলাম।…আপনাকে চিরকাল মনে থাকবে আমার।

সমরেশ চক্রবর্তী বলেছিল। মাধব সোমও বলেছিল। রেখা হাসল।–সেটা কি খুব ভালো কথা হবে?

দুই-একটা মৌন মুহূর্ত। অমর দত্ত হাত তুলে নমস্কার জানালো, আচ্ছা, চলি।

হাত তুলে প্রতি নমস্কার করল, রেখাও, হ্যাঁ, আসুন।

অমর দত্তর কাহিনী শেষ হয়েছে। কিন্তু এ কাহিনী অমর দত্তর নয়। রেখা মিত্রর। অনেক, অনেক দেরীতে জেনেছে বীণা সরকার, রেখা মিত্রর রোগী ভালো করবার রহস্যটুকু কি! অনেক, অনেক দেরীতে জেনেছেন মনোবিজ্ঞানী কর্ণেল পাকড়াশী, কোন নির্দেশই তার মেনে চলেনি রেখা মিত্র। অনেক, অনেক দেরীতে জেনেছে বাকি সকলে, রেখা মিত্র রোগী ভাল করেছে, ফাঁকি দিয়ে নয়, ভালবাসার অভিনয় করে নয়, সত্যিকারের ভালবেসে। পর-পর তিন জনকেই।

হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা আর একজন বেড়েছে। রোগী নয়, রোগিণী। সে রেখা মিত্র।

বারমুডা লিলি

কুণাল বোস হেসেই বাঁচে না। শিবু কাকার দপ্তরে বসেও হেসেছিল। তাই দেখে শিবু কাকা ধমকেই উঠেছিল। বলেছিল, আমি কি তোকে তোয়াজ তোষামোদ করে চলার পাত্র, যে মিথ্যে তোকে বাড়াতে যাব? না কি আমার কাগজটা আঁস্তাকুড় একটা যে। ছাই-ভস্ম যা পাব তাই নিয়ে ছাপার জন্য হাঁ করে থাকব? এত কাল কাগজ চালাচ্ছি, এত লেখা লিখছি কলমের আঁচড় টানা দেখলে কার মধ্যে কি আছে বুঝতে পারি না–আঁচ করতে পারি না? যে লেখা দেখে তোর বাবা অমন আগুন হয়েছে, তোকে কেটে দুখানা করতে পারলে শান্তি হয় বলেছে, আর তারপর মাথার বিকৃতি কি না দেখার জন্য অত চুপিচুপি ডায়েরিটা আমার কাছে চালান করেছে–সেই সব ছাইভস্ম লেখার মধ্যেও একটা সম্ভাবনা দেখেই তোকে আমার কাছে পাঠাতে বলেছিলাম নইলে আমার সময় কি কুল গাছ যে তোদের মতো অকাল কুণ্ড এসে ঝাঁকালেও ঝরঝর করে পড়বে? বাঁদর কোথাকারের।

নিচের কুচকুচে কালো ঠোঁটটা ছাতলা পড়া দাঁতে ঘষে কুণাল সবিনয়ে আপত্তি জানিয়েছে, ওই জীবটার অসম্মান কেন করছেন শিবু কাকা–বরং বাঁদরের কোথাকার বলুন।

শিবুকাকা আবার রেগে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল। (কি বললি? বাঁদরের থেকে ইতর বাঁদরেতর) হাঃ হাঃ হাঃ–ওই জন্যই তো বলছিলাম আদা। জল খেয়ে লেগে যদি যাস তোর হবে। হলে দুটো পয়সারও মুখ দেখতে পাবি বাপ-দাদার হোটেলে খাচ্ছিস বলে দিন-রাত অত লাথি গুতোও খেতে হবে না। তা বলে ছাই ভস্ম যা হোক লিখে আনলেই তো আর আমি ছাপব না–সে রকম কিছু থাকলে তবে কথা। সেটা এমনি হয় না, বাঁদরামি ছেড়ে, মানে বাঁদরেতরামি ছেড়ে অনেক কাঠ-খড় পোড়ালে তবে হয়। কালো লম্বাটে

বাঁধানো ডায়েরি বইটা শিবুকাকা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। যা এখন, অনেক সময় ঢেলেছি তোর জন্যে, আর না।

ওটা হাতে করে কুণাল শিবুকাকার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঝোলানো গোঁফ আর থুতনির নিচের অল্প দাড়ির গোছায় মুখের হাসি ছড়িয়ে পড়ছে। তারপরেই গর্তের প্রায় গোল চোখ দুটো সচকিত। শিবুকাকার ঘরের পার্টিশনের এ ধারে একজন সাব এডিটর আর দুজন প্রফরিডার মাথা গুঁজে কাজ করছে। তাদের থেকে একটু দূরের চেয়ারে বেশ সুশ্রী একটি মেয়ে বসে আছে। বয়সে কুণালের থেকে বছর দুই তিন বড়ই হতে পারে…বছর পঁচিশ ছাব্বিশের কম নয়। কপাল ফাঁকা, সিঁথিতে সরু একটু নিদূরের দাগ ঝিলিক দিচ্ছে। কুণাল শিবুকাকার পার্টিশন দরজার ওপার থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়ে আসতেই চোখাচোখি। ও ঘরে ছিল বলেই মেয়েটিকে এদিকের এরা বসিয়ে রেখেছে মনে হয়। কুণালের লুব্ধ দুচোখ কয়েক নিমেষের মধ্যে নারীদেহ। ছিঁড়ে খুঁড়ে আবার মুখের ওপর এসে স্থির হল। এই চাউনি পড়ে নিতে বা বুঝে নিতে কোনো মেয়েরই ভুল হয় না বা সময় লাগে না। তখন কত রকম দেখতে হয়। সুন্দর মুখে বিরক্তির আঁচড় পড়ে। ধারালো হয়, ঘোরালো হয়, চোখে আগুনও ছোটে। কুণালের তখন আরও মজা লাগে। মনে হয় ও যেন চোখ থেকেই দুটো হাত বার করে দিয়ে কোনো মোহিনী তনু জাপটে ধরেছে, আর রণ-রঙ্গিনী তাই থেকে বেঁকেচুরে গুমরে দুমড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে।

সামনের রমণীমুখ ভালো করে তেতে ওঠার আগেই কুণাল বোস লম্বা পা ফেলে তার দুহাতের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। নিজের চেষ্টায় গড়া চেহারার ছাঁদ ছিরি যেমনই হোক, গলার স্বর যে এই মূর্তির সঙ্গে বেখাপ্পা রকমের মিষ্টি আর নরম তা-ও জানে। নিঃসংকোচে পিছনের দরজাটা আঙুল দেখিয়ে বললে, উনি এখন একা আছেন, আপনি যেতে পারেন।

বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় মেয়েটি নড়ে চড়ে ওঠার আগেই কুণাল বোস ঘরের বাইরে। সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। এখান থেকেও সামনের দরজা দিয়ে সোজা শিবু কাকার পার্টিশন ঘেরা পর্যন্ত চোখ চলে। মেয়েটি ললিত ছন্দে ওই ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছে। মেয়েদের সামনে

থেকে দেখতে বেশি ভালো লাগে কি পিছন থেকে কুণাল বোস ঠিক হদিস পায় না। অনেক সময় খেয়াল করে দেখেছে, যে মেয়েদের সামনে থেকে ভালো লাগে পিছন থেকে তাদের বেশির ভাগই যেন আরো ভালো লাগে। কিন্তু সামনে থেকে দেখতে যাদের হত-কুচ্ছিত লাগে তাদেরও এক একজনকে পিছন থেকে দেখতে অদ্ভুত ভালো। এমন একটা অভিজ্ঞতার কথা হাতের এই ডায়েরিটাতেই লেখা আছে।...আজ এক শ্যামাঙ্গী দীর্ঘাঙ্গীকে দেখলাম বিশ গজ আগে আগে হাঁটছে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুঠাম রমণীঅঙ্গ ঘিরে আমার গর্তে ঢোকা আদেখলে চোখ দুটো বনবন করে চক্কর খেতে লাগল। পা চালিয়ে ফারাক যত কমিয়ে আনছি, ভিতরের পশুটা ততো থাবা খুলছে। চলার ঠমকে সর্বাঙ্গের জোয়ার ঢেউ খেলে খেলে রেখায় রেখায় তটে তটে পা বেয়ে নেমে আসছে। গা ঘেঁষে তিন পা এগিয়ে গেলাম, ঘুরে তাকালাম। কি কুচ্ছিত কি কুচ্ছিত। কেউ যেন আমার গালে কষে একখানা থাপ্পড় বসিয়ে সব কিছুর ছন্দপতন ঘটিয়ে দিল। তারপর আবার আমি পিছনে। সে সামনে।...দেখে দেখে আমার মনে হচ্ছিল দ্বাপরের মানুষগুলো অনেক অকপট ছিল। যুধিষ্ঠিরকে পর্যন্ত দ্রৌপদীকে কয়েক জায়গায় অয়ি নিতম্বিনী বলে সম্বোধন করতে দেখা গেছে। কিন্তু এ-কালের দ্রৌপদীরা ওই বচন শুনলে সোজা একখানা চড় বসিয়ে দেবে

লেখার সময় সেই বাস্তব অনুভূতিটা এমনি প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে উঠেছিল, যে হাতের ডায়েরি না খুলেও মুখস্তর মতো বলে যেতে পারে। দ্বিধান্বিতচরণ মেয়েটিকে শিবুকাকার দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে যেতে দেখা গেল। মনে হয় কোনো লেখা-টেখার তদবির তদারকে আসা। শিবুকাকা ঘরে একা। তার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য কে জানে। বোধহয় দুইই। শিবুকাকার বয়স ষাট, সেইজন্য সুবিধে। সুবিধে ক্যাশ করার। বয়েস কিন্তু গতর যখন নেই দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি?

সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায়। দোকানের ঘড়িতে বিকেল প্রায় চারটে। এক দেড় ঘণ্টা সময় খামোখা নষ্ট। একেবারে নষ্টই বা বলে কি করে। হাতের এই গাবদা ডায়েরিটা তো উদ্ধার হল। এটা এ বছরের নয়। তিন বছর আগের। কোনো মেয়ে গুরুকে প্রেজেন্ট করেছিল। গুরু বলতে প্রদীপ ব্যাণ্ডো।

ডায়েরিটাতে কালোর চেকনাই ঠিকরে পড়ছিল। তার ওপর জ্বলজ্বল করছিল বড় বড় হরফের সোনালি ছাপ। ভিতরে সিল্কের ফিতে। ডায়েরি রসিকদের পছন্দ হবার কথা। কিন্তু কুণাল তখন পর্যন্ত একটুও ডায়েরি রসিক নয়। ওই কলেজে পড়া মেয়েই বা অমন ডায়েরি কোথায় পাবে! বাপ কাকা দাদা কারো কাছ থেকে হাতড়েছে। তারপর যে মুখ করে গুরুকে ওটা প্রেজেন্ট করেছিল, কুণালের মনে হয়েছিল মেয়েটা তার সর্বস্ব ওই হাতে দিয়ে দিলে, ছটার শোয়ে সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম পাকা করে মেয়েটা চলে যেতেই গুরু তাচ্ছিল্য ভরে ডায়েরিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিল, সুন্দর মুখে বিরক্তির হিজিবিজি দাগ ফেলে বলেছিল, ভাল্লাগে না এ-দেশের মেয়েগুলো সব ভীতুর হদ্দ। অন্ধকারে বসে গা। টেপাটেপি করতে দেবে, সিনেমার পর ভালো রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলে আর আলাদা ক্যাবিনে নিয়ে ঢোকাতে পারলে বড় জোর একটু জাপটে ধরতে দেবে আর দুটো চুমু খেতে দেবে–তার বেশি এগোতে যাও অমনি হৃৎকম্প। আর নিউইয়র্কের মেয়েগুলো? শালা বারো বছর বয়সে ছেলেগুলোকে কাঁচপোকার মত হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়–নিজেরা যেমন লোটে তেমনি লুঠতেও দেয়।

গুরুর মুখে নিউইয়র্কের গল্প শুনে শুনে কুণালের দুকান হেজে পচে যাবার কথা। কিন্তু উল্টে যেন মজা নদীতে রসের বান ডাকে। আগে তো শুনেই ওর কান গরম হত, সমস্ত শরীর গরম হত। শুনে শুনে গুরুর নিউইয়র্ক কুণালের কাছেও স্বর্‌গ। উত্তেজনার এমন জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে নাকি? সেখানে উত্তেজনারই অন্য নাম জীবন। সেই জীবনের স্বাদ ভালো করে পাবার আগেই গুরুকে চলে আসতে হয়েছে এই খেদ তার যাবার নয়। গুরুর বাপ ছিল সেখানকার ডাক্তার। সেখানে এক একজন ডাক্তার–মানে কি? আইনের জাল-ছেঁড়া ডাকাত। দুবেলা দুপকেট বোঝাই করে ডলার আনত। সে কি রাজার হালে থাকা। তিন তিনটে গাড়ি ছিল ওদের। একটা বাবার, একটা মায়ের, আর একটা ওদের তিন ভাইয়ের। বাবার গাড়ি বাবা, মায়ের গাড়ি মা চালাতো। আর ওদের তিন ভাইয়ের গাড়ি সফার চালাতো। সেখানে একজন সফারের মাইনে কি তোর ধারণা আছে?

এখানকার মাসের দশ হাজারিরাও সেই মাইনের ড্রাইভার রুখতে হলে ফতুর হয়ে যাবে।

ওর সেই ডাক্তার বাবার আর ভোদা মায়ের কি মতি হল–বাড়ি ঘর বেচে দিয়ে কয়েক আঁক-বোঝাই টাকা নিয়ে দেশে চলে এলো। ঢের সুখ করা গেছে এখন। ছেলেদের জন্যেই নাকি তাদের চাটি-রাটি তুলে চলে আসা। রাগে মুখ লাল করে গুরু বলত, অনেক সুখ তোমরা করলে, আমাদের কি হল? ছেলে মেয়ের সুখের এমন বারোটা যে বাজায় তারা বাবা-মা না শত্রু! এখানে তারা এসে বিরাট বাড়ি হাঁকিয়ে, দাসদাসী বাবুর্চি খানসামা রেখে দিব্যি পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটাচ্ছে। বাবার প্র্যাকটিসও এখানে নামেই, বিকেলে দুঘণ্টার জন্য চেম্বারে যায়–সন্ধ্যায় মায়ের সঙ্গে হুইস্কি গেলে। আমাদের জন্য আসা, আমরাই বা কি দিগগজ হলাম। আমাকে তো অন্তত বি, এ-টাও পাশ করাতে পারলে না। ভাই দুটো যা-হোক মেজে-ঘষে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে।

গুরু মানে প্রদীপ ব্যাণ্ডোর বয়স এখন সাতাশ। কুণালের থেকে চার বছরের বড়। নিউইয়র্ক ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিল তেরো বছর বয়েসে। কুণালের পনের বছর বয়েস থেকে সে এই গুরুর চেলা। এদিক থেকে গুরু উদার বলতে হবে। সে বয়েস দেখে না, বশ্যতা দেখে। হুকুম তামিল করার কেরামতি দেখে। সেই পনের বছর বয়েস থেকে এ এলাকার এমন কি পাড়ার কত মেয়ের কাছে গুরুর চিঠি চালান করেছে, জবাব নিয়ে এসেছে-সন্ধ্যার পর লেকে দূরে দাঁড়িয়ে তাদের পাহারা দিয়েছে, ঠিক আছে? আদর করে কুণাল মাঝে মাঝে শালা গুরু তুমি বলে কথা ঝাড়ে তাতেও গুরু হাসে। আনন্দে পিঠ চাপড়ায়। গুরুর নিজস্ব একটা ছোট্ট গাড়ি ছিল আরো ছবছর আগে পর্যন্ত। গুরুই চালাতো। তার পাশে কোনো না কোনো চটকদার মেয়ে থাকতই। আর পিছনে থাকত কুণাল। শুধু কি বাঙালী মেয়ে? বড় বড় রেস্তেরাঁ বা তার পাশের রাস্তা থেকে অবাঙালী মেয়ে গাড়িতে তোলার ব্যাপারেও গুরু কি কম ওস্তাদ ছিল! চোখাচোখি হলেই বুঝতে পারত কে উঠবে আর কে উঠবে না।

ওই রকম মেয়ের পাল্লায় পড়ে আর নেশার রসদ জোগানোর তাগিদে গাড়িটা জলের দরে বেচে দিয়েছিল। গুরুর নেশা তো আর মদ বা বিড়ি সিগারেট নয়। সে তখন থেকেই হাসিস আর মারিজুয়ানার খদ্দের। বাবা আবার একটা গাড়ি কিনে দেবে ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু আজও দিল না। গুরু এ জন্যে যে ভাষায় নিজের বাবা-মাকে গালাগালি করে শুনে কুণাল মুগ্ধ।

গুরুর সব থেকে বড় পাসপোর্ট তার চেহারা। এখনো। কোনো ছেলে যদি মাখনের দলা হয় অনেক ডাঁশা মেয়ে তাকে পাত্তা দেয় না। কিন্তু সেই মাখনের দলা যদি স্মার্ট হয়, একসঙ্গে চোখ আর ঠোঁটে হাসতে জানে, তার কথার থেকে কাজের হাত যদি বেশি এগোয়–তাহলে কিস্তি মাত। গুরুর এই সাতাশ বছর বয়সে এমন কিস্তি মাত কম দেখল না কুণাল বোস। ভালো ঘরের কলেজে পড়া একে একে দুদুটো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেখল আর ডিভোর্স দেখল। কোর্টে এ পর্যন্ত তিন তিনটে মেয়ে ফুসলে নিয়ে পালানোর কেস দেখল, কি সেনসেশন, কি উত্তেজনা কুণালেরই তখন। যে উত্তেজনার নাম জীবন, গুরু হাতে-নাতে ওকে তাই দেখিয়েছে। পাড়ার কোনো। মেয়ে এখন- গুরুর দিকে তাকালে পর্যন্ত বাপ-মা মেয়েকে শাসন করে। কিন্তু তবু গুরুকে ঠেকায় কে? তার লীলা কি শুধু এই পাড়াটুকুর মধ্যে?

গুরুর মধ্যে অভিজ্ঞতার বীজ বোনা হয়েছে কি আজকে? বীজ বোনা হয়েছে। সেই তের বছর বয়সে–নিউ ইয়র্কে। একটু ভালো করে বোঝার আগে বাবা মা যে তাকে কি আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে, মনে হলে তাদের খুন করতে সাধ যায়। ছেলের। এই কলকাতা শহরে কত লোক অসময়ে পটাপট মরছে–আর তার বাবা মা যেন একটা বেঁচে থাকার খুঁটি ধরে বসে আছে। সম্ভব হলে, নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে আসার জন্যেই বাবা মাকে সে চরম শাস্তি দিত। আর, সেখানকার মেয়েগুলো কি মেয়ে? জলজ্যান্ত আপেল এক একখানা। ফাঁক পেলে পনের ষোল সতের বছরের সেই মেয়েগুলো ওকে বুকে জাপটে তুলে নিয়ে পালানোর জায়গা খুঁজত। চুমু খেয়ে খেয়ে গালে ঠোঁটে জ্বালা ধরিয়ে দিত–ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে গিয়ে।

www.bengaliebook.com

ওকে বুকের ওপরে চেপে ধরে শুয়ে থাকত-আরো কত কাণ্ডমাণ্ড করত শুনলে তোর নোলা দিয়ে জল গড়াবে।

জল যেটুকু শুনতো তাতেই গড়াতে কুণালের।

হ্যাঁ....এই ডায়েরিটার কথা। তিন বছর আগে টেবিলের ওপর গুরু ওটা ছুঁড়ে দিতেই বুকের ভিতরটা চড়চড় করে উঠেছিল কুণালের। ওর ততক্ষণে কেমন যেন বদ্ধ ধারণা, দেবার আগে ওই কালো ডায়েরির চকচকে বোর্ডে অন্তত গণ্ডা আষ্টেক চুমু খেয়েছে মেয়েটা। সেই তাপ ওতে এখনো লেগে আছে। তখুনি বলে বসেছিল, গুরু এই ডায়েরিটা আমাকে দেবে?

-ওটা দিয়ে তুই কি করবি?

কি বললে গুরু খুশি হবে আর উদার হবে কুণালের ততদিনে ভালোই জানা। জবাব দিয়েছিল, মাঝে মাঝে বুকের ওপর রাখব আর চুমু খাব। আমি আর এর থেকে বেশি কি পাব বলো।

শুনে গুরু হেসে সারা। হাসি আর থামতেই চায় না। শেষে বলেছে, আমার শিষ্য হয়ে তোর এ-রকম আনপ্র্যাকটিক্যাল সেলফ-স্যাটিসফ্যাকশন–আঁ? আরে কল্পনার ভোগ তো কবিদের জন্য আর স্পাইনলেস ছেলেদের জন্য! আমার শিষ্য হবে মোস্ট রেকলেস প্র্যাকটিক্যাল–সাধ গেলে হাতে হাতে আদায়। এই যে ডায়েরি দিয়ে গেল এর ওপরে আমি বিরক্ত কেন? সাধ আছে, সাহস নেই। আরে বাপু রেখে। ঢেকে সব দিক বজায় রেখে কতটুকু পাবে–ভিতরে বান যখন ডেকেছে সব দিক তছনছ করে দিয়ে ছোটো না, তবে তো থ্রিল–তবে তো একসাইটমেন্ট তবে তো লাইফ। ডায়েরিটা তারপর ওর দিকে ঠেলে দিয়েছিল, যা নিয়ে যা, দুধের সাধ ঘোলে মেটা।

তার পরেই মাথায় একটা উদার প্ল্যান এসে গেছল। তোকেও ছিটেফোঁটা প্র্যাকটিক্যাল আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করছি। তোর জন্যে একটা টিকিট কেটে রাখব .আর মেয়েটাকে যা বলার বলে রাখব। ছটায় শো, তুই ঠিক সময়ে মেট্রোয় থাকিস।

তিন বছর আগে এই ডায়েরি হাতে করে বাতাস সাঁতরে নিজের ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে ছিল। ব্যাণ্ডোদা যতই মুখ বাঁকাক আর ছেলেমানুষ ভাবুক ওকে, এটুকুতেই যে এত থ্রিল এত উত্তেজনা এ কি ভেবেছিল! বয়েস তো সবে তখন। কুড়ি। বি, এ ফেল করে আর পড়া ছেড়ে সবে গুরুর যোগ্য শিষ্য হয়েছে। তার আগে যেটুকু উত্তেজনার দিন গেছে তার বেশির ভাগ কাল্পনিক। গুরুর চেলাগরি করে। আর তার ভোগ কল্পনা করে যেটুকু আনন্দ। কিন্তু এই ডায়েরিটা বা ডায়েরিতে মেয়েটার স্পর্শ তো আর কল্পনা নয়। ফেরার আগে ওই মেয়ে যে ডায়েরির মলাটে গণ্ডাকতক চুমু খেয়ে নিয়েছে তা-ও কল্পনা বলে স্বীকার করতে রাজি নয় কুণাল। ঘরে এসে ওই ডায়েরির মলাটে গাদা গাদা চুমু খেয়ে বার বার ওটা বুকে চেপে ধরে বেশ একটু নতুন থ্রিল আর উত্তেজনা উপভোগ করেছে। কিন্তু সিনেমা হলে আরো থ্রিল ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সেটা ভাবতে গিয়েই শিরায় শিরায় রক্ত গরম। ওর জন্যেও ব্যাণ্ডোদা টিকিট তো কেটে রাখবে, কিন্তু মেয়েটাকে আবার কি বলে রাখবে? মেয়ের পাশে বসে ছবি যে দেখেনি এমন নয়। আর তখন খুব সংগোপনে আর অন্যমনস্কর মতো এক একবার হাত ঠেকিয়েছে, হাঁটুতে হাঁটু লাগিয়েছে–তক্ষুণি আবার অপ্রস্তুত ভদ্রলোকের মতো গুটিয়ে বসেছে। একবার তো চিত্তির। বার কয়েক ও রকম করার পর হাফটাইমের আলো জ্বলতে দেখে মায়ের বয়সী একজন।

বিকেলে আধঘণ্টা আগেই মেট্রোর সামনে অপেক্ষা করছিল, আর সব থেকে শস্তার সব চেয়ে কড়া সিগারেট টেনে সময় পার করছিল। ঠিক সময় ধরেই ব্যাণ্ডেদা আর সেই মেয়ে হাত ধরাধরি করে হাজির। ও সামনে আসতে ব্যাণ্ডোদা (কুণাল অনেক সময় গুরু ছেড়ে ব্যাণ্ডোদা বলে কারণ এই ডাকের মধ্যে একটা নতুনের চমক আছে। –অন্তত তখন ছিল) পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, এই আমার সেই কচি-কাঁচা লাজুক শিষ্য কুণাল বোস– তুমি আসছ তাই লাজুক তো আসতেই চায় না! সঙ্গে সঙ্গে এক চোখ একটু ছোট করে মেয়েটাকে গুরু একটু ইশারাও করল। ভব্যতার খাতিরে সেই মেয়ে কুণালের দিকে ফিরে একটু মাথা নাড়ল, আর ঠোঁটের কোণে হাসল, আর চোখের কোণে ভালো করে দেখে নিল। গুরুর কি কারসাজি ঠাওর

করতে না পারার ফলে কুণাল মুখে একটু লাজুক-লাজুক ভাব টানাই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবল।

কিন্তু বুকের ভিতরটা সত্যিই তখন একটা বাস্তব থ্রিলের তৃষ্ণায় ধকধক করছিল। এই মেয়ের উঁচু বুক আর টসটসে ঠোঁট দুটো শুকনো ডায়রি নয়– তার থেকে দের ঢের নরম-গরম বাস্তব।

একেবারে সারির শেষের তিনটে সীটে তারা তিনজন। প্রথমে গুরু মাঝে মেয়েটা শেষে কুণাল। কুণালের পরে সেই রো-তে আর সিট নেই। আলো নিভল। ছবি শুরু হল। মেয়ে পুরুষের মাখামাখি লপটা-লপটির হিন্দী ছবি। শুরু থেকে ঢলাঢলি। কিন্তু ছবি দেখবে কি, খানিক বাদেই কুণালের সর্বাঙ্গে কাটা। মেয়েটার হাঁটু আর হাঁটুর ওপরের খানিকটা কুণালের একদিকের সঙ্গে ক্রমে সেঁটে যেতে লাগল। আর কাঁধের ওপরের দিকটা ওর কাঁধের সঙ্গে একটা চাপাচাপির খেলা শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে অন্ধকারেই আবার ঘুরে তাকায়। কুণালের গালে গরম নিঃশ্বাসের ছেকা লাগে।

হাফটাইমের আলো জ্বলতেই মেয়ে আবার শান্তশিষ্ট। মাঝে ভব্যরকমের ফারাক। এক একবার গুরুর কানে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলছে কিছু আর কুঁই কুঁই করে হাসছে। গুরুর তাকানো দেখে মনে হয় মজাটা ওকে অর্থাৎ কুণালকে নিয়েই। রোগাপটকা কুণালের ভিতরে যে তখন মদমত্ত দামাল হাতি দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। সে যদি ওই মেয়ে জানত।

আবার ছবি শুরু হতে একই কাণ্ড শুরু হল। কুণালের শরীরের কণায় কণায় এবারে ডবল সাড়া দেবার ইচ্ছে। কিন্তু ও বুঝে নিয়েছে তাহলে মজা মাটি-ওকে লাজুক ছেলের ভূমিকা নিতে হবে। খানিক এ-রকম চলার পর মেয়েটার একটা আলতো হাত ওর হাতের ওপর এসে পড়ল। পড়ার পর পড়েই থাকল। তারপর উঠল যখন। কুণালের হাতখানা সুদ্ধ নিয়ে উঠল। ওর হাতটা গরম হাতে ধরে চেয়ারের হাতলের তলা দিয়ে টেনে নিজের কোলের ওপর ফেলল। তারপরে ওই হাত কোলের ওপর রেখে আর গরম হাতের আঙুলে আঙুলে খেলা চলল।

ছবি শেষ হবার পর বাইরে বেরিয়ে ঠোঁটের কোণে তেমনি হেসে আর চোখের কোণে তেমনি করে চেয়ে মেয়েটা জিজ্ঞাসা করেছিল, ছবি কেমন লাগল কুণাল বাবু?

নিরীহ লাজুক মুখ করে কুণাল জবাব দিয়েছে, ছবি আর দেখতে দিলেন কই।

চারুমুখির দুচোখ কপালে। আমি আবার কি করলাম।

গুরু হেসে উঠেছিল। বলেছিল, সম্পর্কটা যখন বউদি হতে চলেছে মওকা পেয়ে তুমিও একটু বাড়লে খুব অন্যায় হত না হাঁদা কোথাকারের।

ওকে বিদায় দিয়ে তারা পার্ক স্ট্রীটের দিকে চলে গেছল। আর কুণাল সর্বাঙ্গে জ্বলুনি নিয়ে ঘরে ফিরেছে। পরে গুরুর মুখে শুনেছে, মেয়েটাকে বলে রেখেছিল, শিষ্য–তার দারুণ লাজুক আর দারুণ ভালো ছেলে, সিনেমা হলে বসে ওর যদি ঘাম ছুটিয়ে দিতে না পারো তাহলে মজাই মাটি।

হেসে হেসে গুরু জিজ্ঞেস করেছিল, তা তোর ওটুকু বাস্তব অভিজ্ঞতা কেমন। লাগল বল।

কুণাল গলা শুকিয়ে জবাব দিয়েছে, তুমি শালা এক নম্বরের শত্রু গুরু বুকের মধ্যে এখন সাহারা জ্বলছে–ফের পেলে ওই ভাবী বউদিকে আমি না খুন করে বসে। থাকি।

ওই ভাবী বউদিটিই ছমাস বাদে গুরুর বিরুদ্ধে কোর্টে কেস ঠুকে দিয়েছিল। গুরু নাকি তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সঙ্গে মেলামেশা করত। শেষে। একদিন তার সর্বনাশ করে সরে পড়েছে। মেডিক্যাল চেকআপে পর্যন্ত সর্বনাশ প্রমাণ হয়েছিল। কিন্তু সর্বনাশটা শেষ পর্যন্ত কার মারফৎ হয়েছে সেটা প্রমাণ হয়নি। কারণ জেরায় জেরায় সাবালিকা মেয়ের অনেক গলদ বেরিয়ে পড়েছে।

যাক, এই সুন্দর ডায়েরিটার পাতা একটা দুটো করে ভরাটি হতে শুরু করেছে। আরো সাত আট মাস পর থেকে। হঠাৎই খেয়ালের বশে ব্যাপারটা

শুরু হয়েছিল। তারপর শুরুর তারিফ পেয়ে উৎসাহ বেড়েছিল। ব্যাপার আর কিছু না, ভিতরে কোনো বাসনা যখন দুর্বার হয়ে ওঠে, কোনো ঘটনায় স্নায়ুগুলো যখন উথাল পাথাল করতে থাকে–তখন ডায়েরির পাতায় সে-সব লেখা। লিখে ফেলে তার ওপরে কিছু মন্তব্য করা।

যেমন প্রথমেই লিখেছিল, এই ডায়েরি যার কাছ থেকে পাওয়া সেই ভাবী বউদির। মতো একটি মেয়েকে সমস্ত নিষেধের গণ্ডী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারলে কুণাল বোস কি করে? ওই ভাবী বউদির মতো স্বভাব চরিত্রের মেয়ে নয়, শুধু তার মতো অমন টসটসে দেখতে–কিন্তু তার ভেতরখানা তখন পর্যন্ত কোন সভ্যভব্য সুপুরুষকে নিয়ে কল্পনার জাল বুনছে। অবাধ্যতার জন্য তার ওপর প্রথমে কি ভাবে নির্মম আঘাত করে তাকে বোবা বানিয়ে দিত আগে তাই লিখেছে। কিন্তু বোবা বাধ্য মেয়ে কোন ছেলে চায়? সেই আক্রোশে তাকে কতভাবে নরকের তলায় টেনে নিয়ে চলেছে তার হুবহু বর্ণনা। কিন্তু মেয়েটা যখন শেষে আর বোঝে না, তাকেই যখন নরকের দোসরে। মেনে নিয়েছে, আত্মহুতি সম্পূর্ণ ভাবছে, তখন আবার কুণাল বোস নতুন চমক সৃষ্টিতে মেতে উঠেছে। যে সুন্দরের স্বপ্ন দেখত মেয়েটা, যে স্বপ্নের জাল বুনত, নরক ছেড়ে তাকে নিয়ে সেই দিকে এগিয়েছে। সেই সুন্দরের দরজা তারই বুকের তলায়–একটু একটু করে এবারে সেই দরজা খুলে দিয়েছে। তার সেই স্বপ্নের জালে এসে নিজেই ধরা দিয়েছে। মেয়েটা হতভম্ব হয়ে দেখছে, যার একদিক এমন কুৎসিত নরক, তারই আর একদিক কি অনির্বচনীয় সুন্দর! লেখার শেষে মন্তব্য, আমি কুৎসিত আমিই, সুন্দর আমার একটাকে যে নেবে সে আধখানা নেবে। আমার শালা একটাতে ক্লান্তি ধরে যায় বলে আমি ভোগে কখনো সুন্দর কখনো কুৎসিত।

ভাবী বউদির মতো সুন্দর চেহারার মেয়ের ওপর কুণাল বোসের পুরুষের নির্মম অত্যাচার আর তাকে নিয়ে নরকে তলিয়ে যাবার প্রত্যক্ষ বর্ণনা পর্যন্ত গুরুর দারুণ ভালো লেগেছিল। বারবার বাহবা দিয়েছিল। কিন্তু তাকে নিয়ে আবার সুন্দরের অভিসারে যাত্রা-পর্ব শুনে নাক সিটকেছিল।-ও আবার কি, ক্লাইম্যাক্স থেকে অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স–কেটে দে কেটে দেযত সব সিলি ডে-ড্রিমিং!

খবরের কাগজ খুললেই রোজ কটা করে ধর্ষণের খবর। কুণাল বোস সে-সব। খুঁটিয়ে পড়ে। যে খবর যত নির্মম তার প্রতি ততো আগ্রহ। তার ভিতরে ততো উত্তেজনা। চোখের সামনে সমস্ত ব্যাপারটা কল্পনা করে ভারী আনন্দ পায়। ডায়েরিতে অকপটে সে-সব স্বীকার-উক্তি আছে। সঙ্গে মন্তব্যও–শালার খবরের কাগজগুলো ঘটা করে প্রথম পাতায় এসব খবরগুলো ছাপে কেন? পড়ে সুড়সুড়ি লাগে বলেই তো। আরো মন্তব্য, মেয়ের মতো মেয়ে হলে এ ব্যাপারটা অপছন্দ করার কথা নয়–আসলে ভয় আর লোকলজ্জা। শালার কুকুর বেড়াল গোরু ছাগলও এ-ব্যাপারে মানুষের থেকে ঢের বেশি অকপট আর সৎ।

এটা পড়েও প্রদীপ ব্যাণ্ডো খুব পিঠ চাপড়েছিল।

...রোমাঞ্চকর ডাকাতির খবর পড়তেও তেমনি ভালো লাগে কুণাল বোসের। ঘটনা যতো বড় দরের হয় উত্তেজনাও ততো বাড়ে। এ-সবেরও স্বাদ তাকে পেতে শিখিয়েছে তার গুরু প্রদীপ ব্যাণ্ডো। পয়সা খরচ করে সেক্স আর ক্রাইমের গায়ে কাটা দেওয়া বই কিনে আগে নিজে পড়ে, পরে ওকে পড়ায়। বলে, এই তো লাইফ, থ্রিল আর একসাইটমেন্ট যেখানে নেই সে আবার লাইফ। এই সেক্স আর এই ক্রাইমের ব্যাপার কলকাতায়ও এখন কম ঘটছে না। ডায়েরিতে নিজের ভাবনা লেখা শুরু করার পরে মস্ত একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছিল। কালো অ্যামবাসাডারে চেপে ছজন লোক এসেছিল। সতের মিনিটের আগেই সতের লক্ষ টাকা হাতিয়ে সরে পড়েছিল তারা। এই অপারেশন সারতে গিয়ে মাত্র দুজন লোক খুন হয়েছিল আর জন পাঁচেক জখম। ডাকাতদের কেউ ধরা পড়েনি।

ঘটনাটা কুণাল বোসের কাছে এত সেনশেসনাল মনে হয়েছিল যে তিনবার করে আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে পড়েছে খবরটা। যত ভেবেছে ততো উত্তেজনা বেড়েছে। শেষে ডায়েরি নিয়ে বসেছে।

–মনে মনে আমিও একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে উঠলাম। সঙ্গে সেই ছজনই লোক। আমি তাদের লিডার। সমস্ত প্ল্যান আমার। অপারেশন ফরমূলা আমার। প্রথমে ভেবেছিলাম পাঁচজনকে খুন করলে আর বারো চোদ্দ

www.bengaliebook.com

জনকে জখম করলেই কাজ হাসিল হবে। তাদের রক্তাক্ত মৃতদেহগুলো আমি আগেই চোখের সামনে দেখলাম। দেখলাম এই দেখাটা মন্দ উত্তেজনার ব্যাপার নয়। কিন্তু শেষে আর ওই প্ল্যান ভালো লাগল না। কারণ লোক মারা আর জখম করার উত্তেজনাটা পুরনো ব্যাপার। তার থেকে ঢের বেশি উত্তেজনার ব্যাপার কারো গায়ে একটা আঁচড় না বসিয়ে কাজ সারাটা। কাগজে এমন ডাকাতি নিয়ে দারুণ হৈ-চৈ হবে–পড়তে পড়তে সকলের বুকের তলায়। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বইবে। হ্যাঁ, সেই প্ল্যানেই অপারেশন পাকা করলাম। এক-একজনের রিভলভারের মুখে তিনজন করে লোক পুতুল হয়ে থাকল। স্ট্রং রুমের চাবি আমার হাতে। চোদ্দ মিনিট লাগল টাকার বস্তা পিছনের গাড়ির ক্যারিয়ারে ঢোকাতে। পালাবার সময় ছটা রিভলবার থেকে মাত্র আঠারটা ফাঁকা আওয়াজের দরকার হয়েছিল।

-কিন্তু কত টাকার ডাকাতি সেটা ঠিক করতেই সময় লেগেছে একটু। প্রথমে ওই সতের লক্ষ টাকার অঙ্কটাই মাথায় ছিল। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলাম সতের লক্ষ টাকা আর কত টাকা? ভোগের শেষ দেখতে হলে এ টাকায় আর কদিন চলবে! ডাকাতি তো আমি মাত্র একটাই করেছি বা করলাম। টাকার অঙ্কটা বাড়াতে বাড়াতে সতের লাখ থেকে সত্তর লাখে তুললাম। কিন্তু ওতেও ভোগের শেষ হয় না। ডাকাতি করে সে টাকা তো আর আমি ব্যাঙ্কে রাখতে যাচ্ছি না যে সুদের টাকায় পায়ের ওপর পা তুলে জীবন কাটিয়ে দেব? শেষে সতের কোটিতে এসে থামলাম। কোনো ব্যাঙ্কে সতের কোটি টাকা নগদ থাকে কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমার ডাকাতি আমারই। থাকতে হবে। আমি কাগজ কলম নিয়ে হিসেব করে দেখেছি। মাসে দুলক্ষ করে খরচ করলে (দুলক্ষ কাকে বলে তা-ও আমি জানি না, কিন্তু আমার মনে হল ওতে ভোগের সমস্ত রাস্তা খুলে দেওয়া যেতে পারে।) এক কোটিতে পঞ্চাশ মাস যাব। তাহলে সতের কোটিতে আটশ পঞ্চাশ মাস অর্থাৎ সতের বছর দশ মাস চলবে। এখন আমার বয়েস একুশ (তখন একুশই ছিল), তাহলে তখন বয়েস দাঁড়াবে একানব্বই বছর দশ মাস। তার বেশি ভাবার আর কোনো মানে হয় না। ও...আপনারা ভাবছেন আমার কাঁচা হিসেব-সঙ্গী ছয় জনের ভাগ কী হবে? আসল থ্রিল তো সেইখানে। আমার অপারেশনে লোক মারা নেই, মানে ব্যাঙ্কের নিরীহ লোকগুলোকে

মারা নেই। তা বলে শত্রু মারব না এমন হলপ কে করেছে? ডাকাতির রাতে খেয়ে দেয়ে ফুর্তি করে ঘুমিয়ে আমার সঙ্গীরা কি আর দিনের মুখ দেখেছে? কাজটা কত সহজ। মদ খেয়ে সকলের তখন টইটম্বুর অবস্থা। সেই অবস্থায় আমি নিজের হাতে প্রত্যেকের ড্রিংক সাজিয়ে হাঁক দিলাম, লাস্ট ড্রিংক ফর দি বেড়। হ্যাঁ, ডাকাতির পর কুচকুচে কালো অ্যাম্বাসাডারের বদলে ধপধপে সাদা অ্যামবাসাডার চেপে আমরা দেড়শ মাইল দুরের এক হোটেলে উঠেছিলাম। একসঙ্গে নয়। আলাদা আলাদা। একে একে। কেউ কাউকে চিনি না। একেবারে শেষে সাদা অ্যামবাসাডার হাঁকিয়ে এসেছি একলা আমি। তখন রাত। অন্য ছজন যে যার ঘরে। আমার গাড়ির পিছনের ক্যারিয়ারে সতের কোটি টাকা কে আর জানছে। (ক্যারিয়ারে সতের কোটি টাকা আবার ধরে তো?) যাক সঙ্গীরাও জানে না, আমি শুধু রাতটুকুর জন্যেই আগাম টাকা দিয়ে ঘর বুক করেছি–ভোর রাতে উঠে গাড়ি নিয়ে চলে যাবার কথাও বুকিং ক্লার্ককে বলে রেখেছি। যাক, মনের আনন্দে আমার ঘরের রাতের আসর শেষে আমার অর্থাৎ লিডারের হাত থেকে সঙ্গীরা লাস্ট ড্রিংক ফর দি বেড় নিল। প্রত্যেকের গেলাসে (নিজের বাদে) সেই লাস্ট ড্রিংকে আমি কখন কি মিশিয়েছি সজাগ সচেতন থাকলেও তারা টের পেত না। তখন তো নেশায় বুদ। কি মিশিয়েছি সেটা অবশ্য আমি নিজেও এই লেখার সময় পর্যন্ত জানি না। এমন কিছু যা মদের গেলাস শেষ হবার পরেও ওরা যে যার। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়া পর্যন্ত কোনো কাজ করবে না। তারপরই ওই ড্রিংক লাস্ট ড্রিংকই হবে। আর উঠবে না। আর এই না ওঠাটা যখন জানাজানি হবে তখন আমি কোথায় আর আমাকে সন্দেহই বা করে কে?

-তারপর আমার ভাগের পালা শুরু। যত রকমের ভোগ এই পৃথিবীতে আছে। সব আমার হাতের মুঠোয়। সদয় ভোগ, নির্দয় ভোগ, হিংস্র ভোগ, অহিংস ভোগ, সচেতন ভোগ, অচেতন ভোগ। আমি এই পৃথিবীর একমাত্র ভোগরাজ।

শেষে মন্তব্য, শালা ভোগের কিছু জানো না বলেই এক কথায় নিজেকে ভোগরাজ বানিয়ে শেষ করলে। অমন ভোগে হাবুডুবু খেতেই যদি পারো–

তখন মনের ঘরে মাসে দুলাখের বদলে দুশ টাকা খরচের জীবন ঢের বেশি স্বাদের মনে হবে হয়তো কিন্তু সেটা ওই ভোগের আগে নয়।

এই শেষের মন্তব্যটা শুধু গুরুর পছন্দ হয়নি। নইলে বাকিটা বেশ লেগেছিল। যাক ডায়েরির আগাগোড়া কুণাল বোসের ভিতরের মনটা এখনি ছড়ানো ছিটানো। শিবুকাকা তার লেখা একটুও ভালো বলেনি, কিন্তু মন্তব্যগুলোর মধ্যে আর সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখার মধ্যে কিছু সম্ভাবনা দেখেছে। তবে একটা লেখার প্রশংসাই করেছে। গুরুর মতে যেটা কোনো লেখাই নয়।

লেখাটার নাম ওড অন্ এ বারমুডা লিলি।

পরীক্ষায় ফেল করুক আর যাই করুক চেঁচিয়ে পাঠ্য বইয়ের ইংরেজি বাংলা কবিতা পড়ত, ইংরেজিতে নম্বর পেত একশর মধ্যে বড় জোর তিরিশ। কিন্তু কীটসএর ওড়-অন এ গ্রীসিয়ান আরন তা বলে কম বার চেঁচিয়ে পড়েনি। কুণাল বোসের কল্পনায় এর বিষয়বস্তুও অনেকটা এক রকম। তবে কুণাল বোসের ভাব আলাদা।

..বারমুডা লিলি হল একটা ফুলের নাম। যা কুণাল কখনো চর্ম-চোখে দেখেনি। ঘরের রঙিন ক্যালেণ্ডারে দেখেছে। ক্যালেণ্ডারে লম্বা তকতকে একটা সবুজ ডঁটার ওপরে ফুটে আছে বারমুডা লিলি। তার লম্বা লম্বা সাদা মসৃণ অদ্ভূত নরম ছটি পাপড়ি। ভিতরে রঙ-বেরঙের ছটি কেশর। বিলিতি ক্যালেণ্ডারের আর্ট পেপারে ছাপা ভারী সুন্দর একটা জীবন্ত ফুল দেখলে মনে হবে ওটা শুচিতার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু ওই সবুজ ডাটা বেয়ে উঠছে রঙিন একটা বীভৎস পোকা। পোকার লুব্ধ দুটো চোখ ডঁটার মাথার ওই ফুলটার দিকে। ওই পর্যন্ত উঠে ফুলটা কুরে কুরে খেতে পারলে তার জন্ম সার্থক, জীবন। সার্থক। ক্যালেণ্ডারের ওই ছবিটার দিকে তাকালেই অদ্ভুত একটা শিহরণ হত কুণালের। ছবিটার দিকে চেয়ে থাকত আর কল্পনায় দেখত ওই রঙিন বীভৎস পোকাটা স্থির অব্যর্থ। গতিতে ওই ফুলটার কাছে পৌঁছাচ্ছে কিন্তু ফুল জানেও না কি শোচনীয় তার পরিণতি। কল্পনাটা যত ঘন হত ততো যেন গায়ে কাঁটা দিতে কুণালের, একটা

অস্বাভাবিক রোমাঞ্চ অনুভব করত। সেটা দুঃখের কি বীভৎস আনন্দের ঠিক করে উঠতে পারত না। যদিও জানা কথাই ছবির ওই লোভী পোকা কোনদিনই ফুল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না।

ওই ছবিটা দেখে দেখে মাথায় হঠাৎ একদিন একটা অদ্‌ভুত খেয়াল চাপল কুণালের। ডায়েরির পাতার মাপের এক টুকরো আর্ট পেপার কেটে নিয়ে ওই ক্যালেণ্ডার আর কাগজ, তার এক আর্টিস্ট বন্ধুর কাছে দিয়ে এলো। ক্যালেণ্ডারের ওই রঙিন ছবি আর্ট পেপারে হুবহু তুলে দিতে হবে। ক্যালেণ্ডারের ওই রং ফুল পোকা সব একরকম হওয়া চাই। ঠিক ঠিক হলে একটা ছোট বোতল তাকে প্রেজেন্‌ট করবে। বোতলের লোভে না হোক তাগিদের চোটে আর্টিস্ট বন্ধু তাই করে দিল। রং ফুল পোকা এক রকমই হয়েছে। সেই আঁকা আর্ট পেপারটা এনে কুণাল ডায়েরির বাঁ দিকের পাতায় সাঁটল। তারপর ডান দিকে ওড় অন এ বারমুডা লিলি লিখল।

বারমুডা লিলি, আসলে তুমি এক অনন্তযৌবনা অক্ষতসুন্দর নিষ্পাপ মেয়ে। তুমি নিশ্চিন্তে রূপের ডালি ছড়িয়ে বসে আছ। জানোও না কে তোমাকে গুটিগুটি খেতে আসছে–শেষ করতে আসছে। ও এসে পৌঁছুলে তুমি কি করবে–কেমন। চমকাবে? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে। ভয়ের ছায়া তো আগে চলে। কিন্তু সুন্দরী, তোমার মনে কি ভয়ের ছায়াও পড়ে না? এ যৌবন ছড়িয়ে অমন নিশ্চিন্তে আনন্দে বসে আছ কি করে?…নাকি তুমি জানো, ওই নির্মম যম কোনদিন তোমার কাছে। পৌঁছুতে পারবে না–ওর লুব্ধ চোখ আর জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে ও যেমন আছে চিরকাল সেই রকমই থেকে যাবে?…তাই ঠিক বোধহয়। বাসনার চূড়ান্ত স্বপ্নের নাগাল আমরা কে কবে পেয়েছি? যার পরে আর কিছু নেই এমন ভোগবতীর কাছে কে কবে পৌঁছুতে পেরেছি? হয়তো তার হদিশ পেয়েছি, ওই ভীষণ রঙিন পোকাটার মতো লুব্ধ চোখে তাকে দেখেছি, লোভে হাত চেটেছি, গুটিগুটি সেদিকে এগোতে চেয়েছি। কিন্তু ওই বাসনার ডালি মরীচিৎকার মতো যেমন দূরে তেমনি দূরে। অনন্তযৌবনা বাসনার বারমুডা লিলি লোভের ডগার শেষ মাথায় চিরকালই ওমনি অক্ষতসুন্দর।

www.bengaliebook.com

..আর ডায়েরির শেষ লেখাটার পরের মন্তব্য পড়ে শিবুকাকা একটু ঘুরিয়ে প্রশংসা করেছিল। বলেছিল, ঠিকই তো বুঝেছিস দেখি, তোকে গাধার মতো গোরু কে বলে? জেনে শুনে উল্লুক হয়ে বসে থাকলে কে তোকে ঠেলে তুলবে? শিবুকাকা নাকি প্রাচীন ইতিহাস আর সংস্কৃতির স্কলার ছিল। নিজের কাগজে নিজে লেখেও ওই ছাইভস্ম নিয়েই। কিন্তু তার জিভ যখন নড়ে তখন মনে হয় সে প্রাণিবিদ্যাবিশারদ ছিল। যাক, ওই শেষে কুণাল বোস লিখেছিল তার পরের মন্তব্য পড়লে গুরু নিশ্চয় তেড়ে মারতে আসত।

–আমরা জীবন খুঁজছি। জীবনের অর্থ খুঁজছি। গুরু খুঁজছে। সঙ্গে আমিও। ভোগের তলকূল দেখতে না পেলে জীবনের কি অর্থ? ল, এথিকস, ডিসেন্সি–এসব। অসার কথার লাগাম ছিঁড়তে যদি না পারো তো ভেড়া হয়ে থাকো। ও-সব আবেগ। টাবেগের আমরা ধার ধারি না। আমাদের জীবন মানে সেনসুয়াল প্লেজার। এক ভোগ ছাই করো, অন্য ভোগের পিছনে ছোটো। থ্রিল আর উত্তেজনা জীবনের সার কথা। সেটাই জীবন। তাই মেয়েমানুষের পিছনে ছুটি, তাকে ভালবাসার ফাঁদে ফেলি, নাচি (গুরুর খরচে হোটেলের এক মেয়েমানুষের কাধ ধরে দাঁড়কাকের মতো সত্যি আমি খাসা নেচেছিলাম–উঃ, সে কি থ্রিল!) মদ খাই, ম্যারিজুয়ানা টানি। এই থ্রিল আর উত্তেজনার লোভেই শুধু একবার আমি বাবার পকেট থেকে তার মানিব্যাগটাই হাপিস করে দিয়েছিলাম। এমনি থ্রিল আর উত্তেজনার মধ্য দিয়েই আমরা জীবন খুঁজে চলেছি।

মন্তব্য : জীবন খুঁজছ না এই করে তুমি শালা জীবন থেকে পালাচ্ছ সেটা তলিয়ে ভাবার সাহস নেই কেন?

..কুণাল বোসের এই সম্পদখানা অর্থাৎ এই ডায়েরিটা হারিয়ে গেছল। আর সেই কারণে চোখে একটু আধটু সর্ষেফুলও দেখছিল! হারানো ঠিক নয়, চুরি গেছল জানা কথাই। ওর ঘরে বাড়ির কেউই ঢোকে না। রুচি হয় না বলে ঢোকে না। রুচি যাতে না হয় কুণাল নিজেই সেভাবে ঘরখানা রাখত। ডায়েরিটা থাকত তার। সুটকেসে। গোড়ায় গোড়ায় ওই ডায়েরিটা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার জন্যই চাবি দিত। কিন্তু পরে আর চাবি দেওয়া দরকার মনে করত না। কে আসছে তার ঘরে আর কে-বা দেখছে।...কুণাল

www.bengaliebook.com

খুব ভালো করেই জানে ডায়েরি সরানোটা কার কাজ। বড় বউদি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। বড় বউদি কুণালের থেকে নবছরের বড়। কুণাল তার আওতার মধ্যে ছিল যখন, একটু শাসন-টাসনও করত। সে অবশ্য আট দশ বছর আগে। এখন কাছেও ঘেঁসে না। দূর থেকে সন্দিগ্ধ চোখে দেখে। কুণাল নিজের কানে শুনেছে, দাদাকে একদিন বলছিল, ও যে-রকম মরা মাছের মতো চোখ করে তাকায় ওর কাছে যেতেই ভয় করে। ওর হাড়ে মাংসে শয়তানি। ঢুকেছে বলে দিলাম।

কুণাল বোস রাগ করেনি। বরং মনে মনে হেসেছে। ওর কাছে যা জীবন থ্রিল, এদের বিচারে তা শয়তানি হতেও পারে। যাক, তার কয়েক দিনের মধ্যে সুটকেশ খুলে দেখে ডায়রিটা নেই। নেই তো নেই-ই। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। শেষে বুঝল, কেউ সরালে আর খুঁজে লাভ নেই। সরিয়েছে যে তার আর ভুল কোথায়। বাড়ির লোকের মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছে সঙ্কলের সব চিন্তার বাইরে বিষম কিছু ঘটে গেছে। বাবা। শেষ পর্যন্ত কি করে কুণাল সেই অপেক্ষায় ছিল। যতই ক্ষেপে যাক না কেন, মারধোর করতে সাহস করবে না। আর দাদারা তো নিরীহ গোছের ভীতু মানুষ। ভাইয়ের পয়সা-অলা গুরুর খবর তারা রাখে, কিন্তু তলায় তলায় কোন গ্যাঙ-ট্যাঙের সঙ্গে মেশে কে জানে। বাড়ির এই অনিশ্চিত অবস্থাটাও মন্দ উপভোগ্য মনে হত না শেষের দিকে। এতেও যেন একটু থ্রিল আছে।

অবশ্য গুরু ব্যাঙেদাকে ব্যাপারখানা বলে রেখেছিল। বাড়িতে ঠাই এর পর আর হবে কি হবে না ঠিক নেই। গুরু ঠোঁট উল্টে নিশ্চিন্ত করছে ওকে। বলেছে, আমাদের, ডিকশনারিতে আবার ভাবনা বলে কোনো কথা আছে নাকি। তাড়িয়ে দেয় চলে আসবি।

শেষে দেখা গেল ভেবে-চিন্তে বাবা এই কাণ্ড করেছে। ডায়েরিটা শিবুকাকার হাতে তুলে দিয়েছে। বাবা আর শিবুকাকা ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল, সেই সুবাদে কাকা! একেবারে উল্টো মানুষ দুজনে। বাবা এমনিতে ঠাণ্ডা ভীতু স্বভাবের হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে গেলে বাড়ি মাথায় করে তোলে। তারপর আবার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় চুপসে যায়। নানা রকম ভাবনাচিন্তা মাথায় ঢোকে। কুণালের বেলায়ও তাই হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই। আর শিবুকাকা হাসি-

খুশি মেজাজী মানুষ, খেতে ভালবাসে, গালমন্দ করে জিভের। ঝাল ঝাড়তে ভালবাসে। তার সবেতে উৎসাহ, সবেতে কৌতূহল। এমন না হলে কুণালের এই ডায়েরি পড়েও কিছু সুসম্ভাবনার কথা তার মনে আসে।

ডায়েরি হাতে কুণাল একটা বাসে উঠে পড়ল। এমন খবরটা গুরুকে না দিলেই নয়। ডায়েরি ফিরে পাওয়ার থেকেও শিউলি মাসিক-পত্রের মালিক আর সম্পাদক শিবু আচার্যি ওর মধ্যে এক ভাবীকালের লেখককে আবিষ্কার করেছে এটাই আরো মজার খবর। তাছাড়া, আর এক তৃষ্ণা ভিতর থেকে সুড়সুড় করে ওপরের দিকে উঠে জিভটাকে বার বার শুকিয়ে দিচ্ছে। সেটা সিগারেটের তৃষ্ণা নয়। শিবুকাকার দপ্তর থেকে বেরিয়ে সিগারেট তো পর পর দুটো খেল। এটা তার থেকেও ঢের কড়া তৃষ্ণা। মারিজুয়ানার তৃষ্ণা। গুরু হয়তো তাই টেনে তার নিচের ঘরের ফরাসে চিৎপাত হয়ে আছে।

...বিকেল ছটায় প্রায় নিয়মিত একবার করে ঘণ্টা দুই আড়াইয়ের জন্য পার্ক স্ট্রীটে হানা দিতে হয়। আজ আর হয়তো সেটা হয়ে উঠবে না। বাড়ির লোক বেকার ভাবে কুণালকে। কিন্তু নিজের খরচ, নিজের ছোটখাট নেশার খরচ (বড় নেশার খরচ তো গুরু গৌরী সেনের কাছ থেকেই আসে), এমন কি নিজের জামা কাপড়ের খরচের জন্যও কারো কাছে তাকে হাত পাততে হয় না। এই রোজগারের ব্যবস্থাও গুরুর কল্যাণেই হয়েছিল অবশ্য। এখন নিজের চেষ্টায় পসার বেড়েছে। তাদেরও মতো জীবন। খুঁজছে অথচ ভিতরে ভীতুর ডিম এমন লোকের কি অভাব আছে? এই লোকেরা তার খদ্দের। তাদের মধ্যে বাঙালী আছে, অবাঙালী আছে।...বছর খানেক আগে গুরুর সঙ্গে একবার বম্বে আর গোয়ায় বেড়াতে গেছল। সেখান থেকে গুরু গাদা গাদা ব্লু পিকচার আর ব্‌লু-ফিল্ম কিনেছিল। ততদিনে সে-সব দেখে-দেখে গুরুর তো বটেই, কুণালেরও চোখ পচে গেছল–রক্তমাংসের জ্যান্ত মেয়েগুলোর মধ্যেই এখন আর আগের মত থ্রিল খুঁজে পায় না–এ-তো ছবি আর ফিলম! কিন্তু তবু গুরু কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করে এত ছবি আর ফিলম কিনছে কেন মাথায় ঢোকেনি। পরে গুরুই বলেছে, কেন? কলকাতায় এগুলোর দারুণ ডিম্যাণ্ড–যে দুটো দোকান থেকে গুরু পর্ণোগ্রাফির বই কেনে বা পয়সা দিয়ে বাড়ি এনে পড়ে, আসার

www.bengaliebook.com

আগে সেই দুটো দোকান থেকেই বলে দিয়েছে ভালো মাল পেলে ভালো দামে কিনবে। হ্যাঁ, গুরুর পর্ণোগ্রাফি পড়ার ঝোঁক এখনো আছে। বলে, মানুষের ভোগের নিত্য নতুন যত রকমের বৈচিত্র্য আছে, কোনো কোনো লেখায় তা মেলে। এতে দস্তুরমতো মাথা-খাটানোর স্কোপ আছে। স্টিল ছবি বা ফিল্ম-এর থেকে বইয়ের মতো বই হলে ঢের বেশি ইন্টারেস্টিং।

গুরু বলল, এগুলো কেমন মোটা লাভে ঝেড়ে দিই দেখিস–তোকেও লাভের কিছু ভাগ দেব। আর ওই দুটো দোকানের মালিকের সঙ্গেও তোর আলাপ করিয়ে দেব। খদ্দের আনার চৌকস লোক তো তাদের সব সময়ই দরকার হয়। কুণাল বোস এখন এই দালালির কাজে পাকা হয়ে গেছে। কাঁচপোকার মতো খদ্দের ধরে নিয়ে আসে। আবার নিজেও ঘুরে ঘুরে বেশি লাজুক খদ্দেরের কাছে সাপ্তাহিক ভাড়ায় ছবি আর পর্ণোগ্রাফির বই পৌঁছে দেয়। এই খদ্দেররাই আবার কদিন গেলে পরদায় মুভি ব্‌লু ফিল্ম দেখার আশায় ওকে তেল দেয়।

অকাতরে এর জন্যে তারা মোটা টাকা খরচ করে। কুণালের ঝোঁপ বুঝে কোপ, অর্থাৎ খদ্দেরের পকেটের ওজন বুঝে মাশুল আদায়। এই করে দালালির রোজগার বাড়ছেই। অথচ এক বছর আগেও কি জানত ওই দুটো দোকানেরই গোপনে মুভি ব্‌লু ফিল্ম দেখানোর এমন পরিপাটি ব্যবস্থা আছে?

যা ভেবেছিল তা নয়। গুরু চিৎপাত হয়েই তার এক্সক্লুসিভ নিজের ঘরের ফরাসে শুয়ে আছে। তার পাশে দুটো পোস্টকার্ড সাইজের ফটো পড়ে আছে, হাতেও একটা খুব মনোযোগ দিয়ে সেই ফটো দেখছে গুরু!

কুণাল শব্দ না করে পাশে বসল। আলতো হাতে ওই বাকি ফটো দুটো তুলে নিল। দুটো ফটোই একটা মেয়ের। ফুটফুটে সুন্দর কচি মুখ। বড় জোর বছর সতেরো আঠারো হবে বয়েস। ডাগর চোখ। চোখের পাতা ফেললে বোধহয় নাকের ডগা অনেকটা ছাড়িয়ে যাবে। মোটাও নয়, রোগাও নয়। সব থেকে চোখে পড়ার মতো মেয়েটার মুখের কমনীয়তা। কেউ যেন ছাঁচে গড়ে কমনীয়তার রস উপুড় করে ঢেলেছে।

হাতের ছবিটা সামনে রেখে গুরু আড়চোখে কুণালকে দেখছে আর টিপটিপ হাসছে। চোখাচোখি হতে বলল, দেখে ফেললি তো! তোকে অবাক করে দেব বলে একমাস ধরে চেপে বসে আছি।

–কি ব্যাপার গুরু, এ আবার কোথাকার হরী পরী? কিন্তু এ তো একেবারে কচি!

তেমনি হেসে গুরু জবাব দিল, বাগবাজারের। হাতের ফটোটা এগিয়ে দিল। দেখে ফেলেছিস যখন এটাও দ্যাখ।

অর্থাৎ এটা কচি বলার জবাব। একটু আড় হয়ে মেয়েটা বাঁ-হাত মাথার পিছনে তুলে খোঁপা ঠিক করছে–সেই সময়ের ছবি। ফলে পিছনের খানিকটা আর বুকের। এক দিকের সুডৌল মাধুরী যেন উপচে পড়েছে। চোখ ফেরানো যায় না।

গুরু হৃষ্টমুখে জানান দিল, এ ছবিতে কোন কায়দায় কি তুলেছি ও মেয়ে নিজেও..। জানে না।…তা কি রকম মনে হচ্ছে?

দারুণ।

চোখে দেখলে রাতে তোর ঘুম হবে কিনা সন্দেহ। দেখবি?

বাগবাজারে গিয়ে?

ইদানীং তো আমি প্রায় রোজই যাচ্ছি। এই ফটোটা আমার থাকবে, আজ ওই ফটো দুটো দিয়ে আসতে যাব। চল…।

কুণাল বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত থাকে পার্ক স্ট্রীটে। সে-সময় গুরুর কোন্ লীলা চলছে জানবে কি করে। লোভ হচ্ছে বটে, আবার নেশার লোভ নিয়ে এসেছিল তা ও বাতিল করতে মন চায় না। বলল, একটু বড় গাঁজার ইচ্ছে ছিল যে গুরু…।

বড় গাঁজা অর্থাৎ মারিজুয়ানা। গুরু আমল দিল না। বলল, ও-সব এসে হবে, আগে বড় গাঁজার রাণী দেখবি চল।

গুরু তৈরী হয়ে রাস্তায় বেরুলো। ট্যাক্সি নিল! হুকুম করল, বাগবাজার।

ডায়েরি ফেরত পাওয়া বা কুণালের লেখক হবার সম্ভাবনার মজার খবরটা আর দেওয়াই হল না। ওর হাতের সেই কালো ডায়েরিটা গুরুর চোখে পড়েও পড়ল না। ট্যাক্সি ছুটেছে আর এদিকের রসের ব্যাপারখানা কি থেকে কি গড়াচ্ছে ব্যাঙোদা মনের আনন্দে সেই ফিরিস্তি শোনাচ্ছে শিষ্যকে।...ওই ফটোর মেয়ের মা গুরুর মায়ের ছেলেবেলার খুব বন্ধু ছিল। একদিন দুজনের দুজনকে না দেখলে চলত না এমন নাকি। হঠাৎ এর মধ্যে একদিন কার মুখে শুনেছে সেই ছেলেবেলার বন্ধু আজ চৌদ্দ বছর ধরেই কলকাতায়। আমেরিকায় নয়। সে দিন-আনা দিন-খাওয়া গরীবের বউ আমেরিকা ফেরত এত বড়লোক বান্ধবীর কাছে আসবে কি আসবে না সেই দ্বিধা ছিল। শেষে ইচ্ছেটাই বড় হয়েছে। ফোন গাইডে ঠিকানা দেখে ছোট মেয়েকে সঙ্গে করে এক-সন্ধ্যায় চলেই। এসেছে। নিচে তখন গুরু ছিল। তার সঙ্গেই মা-মেয়ের প্রথম দেখা। সে-যে কি দেখা গুরুই জানে। এত বড় বাড়িতে পা ফেলে দুজনেই তারা বেশ জড়সড়। চন্দনা। মানে ফটোর মেয়ে সেদিন একখানা ঘন নীল শাড়ী পরে এসেছিল। গুরুর মনে হচ্ছিল, নীলের মধ্যে আকাশের চাঁদখানা মুখ বাড়িয়ে আছে।

কাকে চাই শুনে সঙ্গে করে দোতলায় নিয়ে চলল। বাবা মা তখন মুখোমুখি বসে মদ গিলছে জেনেও। ছেলেবেলার বান্ধবী শুনে আর নিরাভরণা মহিলার একেবারে সাদামাটা বেশবাস দেখেই তার মগজে একটা আশা উঁকি ঝুঁকি দিয়ে গেছে। বান্ধবীকে স্বামীর সঙ্গে মদের বোতল আর মদের গেলাস নিয়ে বসা দেখেই তো মহিলার হয়ে গেল। ওদিকে বাবা-মাও অবাক। গুরুই ভিতরে ডাকল, আসুন মাসিমা ভিতরে আসুন। মা-কে বলল, তোমার ছেলেবেলার বন্ধুকে চিনতে পারছ না?

নাম বলার পরেও ব্যাঙোদার মায়ের চিনতে সময় লাগল একটু। বাবা সাহেবী কায়দায় নিজে উঠে ওদের বসতে আপ্যায়ন করল। তারপর অন্য

www.bengaliebook.com

ঘরে চলে গেল।ওরা জড়সড় হয়ে বসল। ব্যাঙেদা বাইরে থেকে লক্ষ্য করল, চেনার পরেও মা তেমন আগ্রহ দেখালো না। ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করল, ড্রিংক চলে কিনা। মহিলা এমন মাথা নাড়ল। যে বাইরে থেকে ব্যাঙোদা হেসেই ফেলল। সে যেন উঠে ওই ঘর ছেড়ে ছুটে বেরুতে পারলে বাঁচে। দুচার কথায় মা তার ঘরের খবর নিল। মহিলা বাগবাজারে থাকে।চন্দনারা চার বোন। চন্দনা ছোট। বড় তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী পোস্ট অফিসের চাকরি থেকে এ বছরেই রিটায়ার করেছে, এখন ডায়বেটিসে প্রায় শয্যাশায়ী। মায়ের জেরার মতো প্রশ্নে দুই এক কথায় এইসব জবাব এসেছে। একটু বাদেই মহিলা বলল, উনি গেলাস রেখে চলে গেলেন, আমি অসময়ে এসেছি, আজ উঠি। ব্যাঙোদার মা আপত্তি করল না, মাথা নাড়ল। ওরা উঠতে বলল, তোর এই ছোট মেয়েটা তো বেশ সুন্দর হয়েছে, বিয়ের চেষ্টা করছিস নাকি? মহিলা মিনমিন করে জবাব দিল, সে-রকম কিছু না, সবে এবার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিল…এখনো ফল বেরোয়নি…বয়েস মাত্র সতের।

তারা নামার আগেই ব্যাঙোদা সরে গেছল। তার বাবাকে বলেছে, তোমার গাড়িটা নিয়ে ঘণ্টাখানেকের জন্য বেরুচ্ছি। রাতে তার বাবা কলেও বেরোয় না গাড়ির ও দরকার হয় না।

মা মেয়ে খানিকটা এগোবার পর পিছন থেকে গাড়ি থামিয়ে ব্যাঙোদা তাদের ধরেছে। নেমে এসে পিছনের দরজা খুলে দিয়ে মহিলাকে বলেছে, উঠুন মাসিমা –পৌঁছে দিচ্ছি।

মা মেয়ে দুজনেই খুব হকচকিয়ে গেছে। মহিলা বলেছে, আমরা তো বাগবাজারে থাকি

ব্যাঙোদা বলেছে, গাড়িতে বাগবাজার আর কতক্ষণের পথ। আর বলেছে, পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে বাগবাজার থেকে এসে আপনি কেমন দেখা করলেন আমি দেখেছি, আর বুঝেছি, এমন জানলে আপনি আসতেন না। তাই আমিই যেটুকু পারি প্রায়শ্চিত্ত করি–উঠুন উঠুন পিছনে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে।

www.bengaliebook.com

মহিলা তাড়া খেয়ে উঠে বাঁচল। মেয়েটা আদব-কায়দা জানে না বলে সেও মায়ের পিছনে উঠল। গাড়ি হাঁকিয়ে সামনে চোখ রেখেই ব্যাঙোদা আলাপ জুড়ে দিল। আর। ফাঁকে ফাঁকে রিয়ার গ্লাসে মেয়েটাকে দেখতে লাগল। সংকোচ কাটিয়ে মহিলা বলল, তুমি এভাবে গাড়িতে আমাদের পৌঁছে দিতে চললে, তোমার মা হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন।

ব্যাঙোদা বেশ গলা ছেড়ে হাসল (ওটা সরলতার লক্ষণ জানে), জবাব দিল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মাসিমা, আমাদের কারো ব্যাপারে কারো ইন্টারফিয়ার করা রীতি নয়–একদিক থেকে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তা আমার মায়ের সঙ্গে এককালে খুব ভাব ছিল বুঝি আপনার?

-খুব। এই জন্যেই তো…

কিছু বলতে গিয়ে থমকালো। আবারও হা-হা হেসে ব্যাঙোদা বলল, আপনাকে কিছু লজ্জা পেতে হবে না, আমি একনজরেই সব বুঝে নিয়েছি। মা অনেক বদলেছে, অনেক বড়লোক হয়েছে। তবে আমার শুধু অনুরোধ বাবা মাকে দেখে আপনি তাদের ছেলেকে বিচার করবেন না। মায়ের আচরণে আজ আমি কোথায় আঘাত পেয়েছি। জানলে আমার জন্য আপনার কষ্ট হত।

মহিলা বলেছে, সে-কি কথা বাবা, আমি এরই মধ্যে বুঝেছি তুমি সোনার ছেলে।

বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়ে ব্যাঙো দেখেছে, নিতান্তই দীন দশা তাদের। ভদ্রলোক.. হয়তো বড় তিন মেয়ে পার করতেই ফতুর হয়েছে। মেয়েগুলোর চেহারা খাসা বলে। তবু পার হয়েছে। ভদ্রলোক সত্যিই প্রায় অথর্ব। একবার: ডায়বেটিক স্ট্রোক পর্যন্ত। হয়ে গেছে। তাকে দেখার কর্তব্যেই ব্যাঙোদা এরপর: ঘন ঘন এসেছে। তাদের চোখে সে তখন আর সোনার ছেলে নয়, হীরের টুকরো ছেলে। হ্যাঁ, মহিলা ততদিনে তারও খোঁজ খবর সব নিয়েছে বইকি। অবশ্য ব্যাঙোদার কাছ থেকেই। গেলেই একরাশ ফল মিষ্টি নিয়ে যায়। মহিলা কিছু বলতে গেলে অভিমান করে, আমাকে

ছেলে ভাবলে কিছু বলবেন না, আমার মা আছে, কিন্তু আপনাকে দেখার আগে আমি মা পাইনি।

পাঁচ দিন আগে ব্যাণ্ডোদা তিন হাজার টাকা জোর করে মহিলার হাতে গুঁজে দিয়েছে–মেসোমশাইয়ের সব থেকে ভালো চিকিৎসা হওয়াই চাই। মহিলা তিন হাজার টাকা একসঙ্গে দেখেছে বলে মনে হয়নি ব্যাণ্ডোদার। তার যে দেবার অধিকার আছে তার দুদিন আগে মহিলাকে সে সেটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, আমাকে যদি খুব অপছন্দ না হয়, তাহলে যেদিন বলবেন সেদিন আমি গাড়ি নিয়ে এসে আপনাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাব…অবশ্য আমার ব্যাপারে আমার ডিসিশনই ফাইন্যাল, তবু একটা ফরম্যালিটির ব্যাপার আছে তো। আমি মাকে বলেই রেখেছি, ওঁদের আপত্তি না হলে চন্দনাকে বউ করে ঘরে তোলার জন্য রেডি থেকো।

মহিলা তো আকাশের চাঁদ হাতে পাবেই। মা রাগ করেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে ব্যাণ্ডোদা আবার সেই হা-হা হাসি হেসেছিল বলেছিল, এবারে গিয়েই দেখতে পাবেন। তাছাড়া জানেন তো কারো ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করা আমাদের রীতি নয়।

যাক, ব্যাণ্ডোদার অভিমান দেখেই মহিলা সেই তিন হাজার টাকা হাত পেতে নিয়েছে। তারপর এইসব ছবি-টবি তুলতে দিতে আর বাধা কোথায়। ব্যাণ্ডোদার আফসোস, ওই দুটো খুপরি ঘর, চন্দনাকে সেভাবে একলা পাচ্ছে না–তবে পাবার চান্স এবারে একটু হয়েছে। ব্যাণ্ডোদা বলল, মেয়েটা এখনো এমন চেয়ে থাকে না, যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না কি হতে যাচ্ছে। তখন ইচ্ছে করে, ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে একেবারে পিষে ফেলি, আর টসটসে চোখ দুটো দাঁতে করে ছিঁড়ে আনি।

ওরা পৌঁছুলো। কুণাল দেখল মেয়েটাকে। ছবি অত সুন্দর, কিন্তু এর বুঝি তুলনা নেই। দেখামাত্র সদ্যফোঁটা যুঁই ফুলের মতো মনে হল কুণালের। আড়চোখে কুণালকেও দেখল। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির দাগ পড়ল একটু। ছাগলদাড়ি দেখে হাসি পাচ্ছিল। বোধহয়। যে-লোকের বন্ধু, কুণালেরও আদর যত্ন কম হবে কেন? যতক্ষণ ছিল ওরা, চন্দনার মায়ের অস্থির অস্থির

ভাব। এরই মধ্যে ফাঁক বুঝে ব্যাঙোদা বার দুই চোখে চোখে কথা কইতে চেষ্টা করল চন্দনার সঙ্গে। কিন্তু চন্দনার আয়ত গভীর কালো চোখে আর দুটো ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির আভাস খেলা করে গেল শুধু। আর খেয়াল না করে ব্যাঙোদা একটু কাছাকাছি হতে চেষ্টা করলেই তেমনি খেয়াল না করেই যেন ওই মেয়ে একটু তফাতে সরে যায়। দুবার হয়েছে এমন। আ-হা-হা, কুণালের চোখে পলক পড়ে না–কি যে দেখাচ্ছিল না মেয়েটার মুখখানা তখন–যেন একখানা কালো মেঘের সঙ্গে চাঁদের লুকোচুরি খেলা। উপমা ঠিক হল না। চাঁদ হাসে। এই মেয়ের মুখে শুধু একটু হাসির আভা ছড়ায়।

ওঠার সময় চন্দনার মা ব্যাঙেদাকে জিজ্ঞেস করল, কাল আসছ তো বাবা? কুণালকেও নিয়ে এসো।

ব্যাঙোদা বলল, কাল হয়ে উঠবে না…দেখি। আপনাকে আমাদের বাড়ি কবে নিয়ে যাচ্ছি বলুন?

–যেতে তো হবেই, শীগগিরই যাব…তবে আমার কেমন ভয় করে বাবা।

জবাবে কুণাল ব্যাঙোদার হা-হা হাসির একটা নমুনা দেখল।

আবার ট্যাক্সি। ব্যাঙোদা বলল, কি রকম বুঝলি?

কুণাল ঝুঁকে পায়ের ধুলো নিতে গেল।তোমার জবাব নেই গুরু, পায়ের ধুলো দাও। দারুণ-দারুণ–আমার বুকে চিতার আগুন জ্বলছে।

গুরু খুশি।

-তোমার মাকে সত্যি বলে রেখেছ?

-না বলার কি আছে! বলতে তো হবেই। তা কেমন লাগল বল!

–বললাম তো জবাব নেই। বয়েস সতেরো হলেও খুব বাড়ন্ত গড়ন।

–বয়েস সতেরো নয়, আঠারো। আমার সাতাশ শুনে ওর মা-ই স্বীকার করেছে। আঠারো না হলে সব-দিকে অমন ডবকা হয়?

–তুমি কাল আসছ না বললে, ফের কবে আসছ?

–পরশু। মুচকি হাসল।তবে পরশু তোকে আনা যাচ্ছে না।

–কেন?

চন্দনার বাবাকে নিয়ে ওর মা পনের দিনে একদিন পোলিক্লিনিকে দেখাতে যায়…পরশু শনিবার, যাবে আমি কদিন আগেই শুনেছিলাম। ঘণ্টা কয়েকের মামলা। পুরনো ঝিটা অবশ্য বাড়ি আগলে বসে থাকে, তবু এই মওকায় তাকে এদিক ওদিক সরিয়ে চন্দনাকে দুই একবার বুকে চেপে তো ধরতে পারব আর কষে দুচার করে চুমুও খেতে পারব–এবারে কোন শালা ঠেকায়।–তা তোর ভিতরটা খুব চড়চড় করছে?

–খাঁ-খাঁ করছে।

–সত্যি বলছিস?

–এই দেখানোর আগে আমার চোখ দুটো তুমি অন্ধ করে দিলে না কেন গুরু।

প্রদীপ ব্যাণ্ডো হাসতে লাগল। খানিক বাদে হঠাৎ বলল, যা এত যখন..ছমাস। এক বছর বাদে সুবিধে বুঝে তোকেই দিয়ে দেব।

কুণাল আঁতকে উঠল।–দিয়ে দেবে!

-না তো কি! কোন একটা মেয়েকে নিয়ে আমি জীবন কাটাবো ভাবিস নাকি? ঐ আগের অন্য বউ দুটোর মতো হবে না–সাপের মতো ফেস-ফোঁস করবে না…ঠিক চিট করা যাবে। তোকে নিয়ে আমার একটা দায়িত্ব আছে?

রাত নটা নাগাদ কুণাল বাড়ি ফিরে দেখে শিবুকাকা বসে আছে। সামনে বাবা আর দাদারাও আছে। ওকে দেখেই শিবুকাকা বলল, তোর কথাই এদের বলছিলাম এতক্ষণ। তোর সাবজেক্ট ঠিক করে ফেলেছি

বাবা আর দাদাদের মুখ দেখে মনে হল তারা আশার কথাই শুনছিল কিছু। বাবা বলে উঠল, আগে কাকার পায়ের ধুলো নে হারামজাদা পায়ের ধুলো নে।

কুণাল পিতৃ আদেশ পালন করল।

শিবুকাকা বলল, ওই বাঁদরেতরদের নিয়েই তোর ফীচার স্টার্ট করব। মানে তরুণের মন নাম দিয়ে তুই মাসে একটা করে ফীচার লিখবি। এক এক পর্যায়ের এক-একটা তরুণ:বেছে নিবি–তার মনের কথা সুখ দুঃখের কথা শুনবি তারপর। লিখবি। শেষে তোর মন্তব্য জুড়ে দিবি। মন্তব্য ওই রকম সরস হওয়া চাই–বুঝলি কোন রকম?

কুণাল সুবোধ ছেলের মতো মাথা নাড়ল, বুঝেছে।

প্রত্যেকটা লেখার জন্য পঁচিশ টাকা আর ঘোরাঘুরির জন্য পাঁচ টাকা করে পাবি। সেরকম উতরোলে বই ছাপার ব্যবস্থাও আমি করে দেব। বাবাকে বলল, তুমি কিছু ভেব না ভায়া, ওর ভার আমি নিলাম–আজ পর্যন্ত অনেক গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করেছি।

বাবা কৃতজ্ঞতায় গদগদ।

.

আরো রাত্রি।

ঘুম থেকে ধড়মড় করে একেবারে বিছানায় উঠে বসল কুণাল। বেডসুইচ টিপে আলো জ্বালল। ঘেমে গেছে। এ কি অদ্ভুত স্বপ্ন রে বাবা! ঘুরে ঘরের কোণের সুটকেসটার দিকে তাকালো। না, থাক–স্বপ্ন ছাড়া আর কি। কিন্তু বুকের ভিতরটা ধপধপ করছে। এখনো। হাত বাড়িয়ে ড্রয়ারটা খুলল। ছোট

হুইস্কির বোতলটা খুলে কাঁচাই গলায় ঢেলে দিল। দুই একবার গা ঝাঁকানি দিয়ে টেবিলের গেলাস থেকে অল্প একটু জল খেল। বোতলটা ড্রয়ারে রেখে আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আর আসে না। যতবার চোখ লেগে আসে, গুরুর মুখ আর চন্দনার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে।...চন্দনাকে বুকে চেপে গুরু চুমু খেতে যাচ্ছে। কাল বাদে পরশু দুপুরে যা ঘটবে।

বার কয়েক এ-রকম হতে আবার বেডসুইচ টিপে উঠে বসল। নিজের উদ্দেশে গাল পাড়ল, শালা পেট জ্বালিয়ে দিয়ে তোর জেগে খোয়াব দেখা বার করছি। ড্রয়ার খুলল। হুইস্কির বোতলটা এবারে গলায় ঢেলে শেষই করে দিল।

.

পরের দিন।

দুপুর তিনটেয় একটা রিকশ চেপে কুণাল বোস বাড়ি ফিরল। এই দুপুরে ঘরের বাইরে কেউ নেই, নইলে ওকে দেখলে হাঁ হয়ে যেত। ট্রাউজারের ওপর ওর গায়ে শুধু একটা সুতির গেঞ্জি। জামাটা এক হাতে গোল করে দলা পাকানো।

রিকশা ভাড়া দিয়ে নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে এলো। দলা পাকানো জামাটা চৌকির কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সুটকেস খুলে কালো ডায়েরিটা বার করল। ড্রয়ার হাতড়ে একটা পুরনো ব্লেড নিয়ে বসল। ওড় অন বারমুডা লিলির পাতাটা খুলল। তকতকে সবুজ ডাটার ওপর বসা রঙিন বীভৎস পোকাটার মাথাটুকু শুধু ব্লেড দিয়ে কেটে দিল। তারপর নতুন পাতায় চলে এলো। কলম বার করল। শিবু কাকার কাগজের জন্য তরুণের মনএর প্রথম বা শেষ ফীচার এক্ষুণি লিখে ফেলবে। বারমুডা লিলির লেখাটা পছন্দ হয়েছিল যখন, এ লেখাটা নিশ্চয় আরো ঢের বেশি পছন্দ হবে।

-আমি এক্ষুণি গুরুর বাড়ি থেকে ফিরলাম। বেলা বারোটা থেকে পৌনে তিনটে পর্যন্ত তার ওখানে তার সঙ্গেই ছিলাম। গুরু পরের দিনের

অপেক্ষায় মশগুল। আর আমি? না, জীবনে এত থ্রিল আর এমন উত্তেজনার স্বাদ আমি পাইনি। গ্র্যাণ্ড–যাকে বলে সুপার গ্র্যাণ্ড। অথচ নেশা কেবল একলা গুরুই করছিল। আমি যোগান দিয়ে চলেছিলাম। গুরুর তখন আমার দিকে মন দেবার চোখ কোথায়। ভাবে মশগুল। তার থেকে ঢের বেশি নেশায় মশগুল। আমার নেশা যোগানদারির ব্যাপারটা তো আর খেয়াল করে দেখেনি। কেবল টেনেই চলেছে।…তারপরে একসময় মাথা আর তুলতে পারছে না। চোখ আর খুলতে পারছে না। আমার থ্রিল আর উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড!

সময় হয়েছে মনে হতে গুরুর ড্রয়ার খুললাম। খাপ থেকে তার সোনালি বাঁটের বিলিতি ক্ষুরটা বার করলাম। গুরু বরাবর নিজের এই ক্ষুরে কামাতে ভালবাসে। গুরুর পাশে বসলাম। বাঁ হাতে তার বালিশটা ঘাড়ের একটু তলার দিকে নিয়ে এলাম। তারপর সেই হাতেই থুতনিটা একটু ওপরের দিকে ঠেলে বললাম, গুরু মুখখানা একটু ওপরের দিকে তোলো তো

চোখ খুলতে না পেরে গুরু খুব অস্পষ্ট গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে চেষ্টা করল, কি করবি…

-তোলোই না, যা করব তুমি টেরও পাবে না। থুতনি আরো ঠেলে তোলার কাজটা আমিই করলাম। তারপর চেপে ধরে চোখের পলকে যা করার করে ফেললাম। ফিনকি দিয়ে এক ঝলক রক্ত আমার চোখে মুখে দাড়িতে আর জামায় লাগল। কিন্তু নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি থামি কি করে? কসেকেই বা লাগল। গুরু বার কয়েক মাত্র হাত-পা ছুঁড়ল। আধ-কাটা খাসীকে আমি এর থেকে ঢের বেশি পা ছুঁড়ে দাপাতে দেখেছি। নেশার জন্য অত পারে নি কি, কি জন্য আমি জানি না। আমার দুহাতে লালে লাল। ফরাস রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গুরুর রক্ত যে এমন বিষম লাল আর এত গরম কে জানত। ছুটে বাথরুমে এলাম। ভালো করে মুখ হাত ধুলাম। জামাটা খুলে পুঁটলি করলাম। আমার হাতে সময় খুব নেই জানি। পুলিশ ধাওয়া করার। আগে বাড়ি গিয়ে শিবু কাকার তরুণের মন লিখে ফেলতে হবে।

রিকশা চেপে বাড়ি চলে এলাম। লিখতে বসলাম।...যা বলছিলাম, ওই বীভৎস রঙিন পোকাটা বারমুডা লিলির কাছে পৌঁছে যাবে এ কেমন করে হয়? কি করে হয়? অথচ পরশু মাঝরাতে আমি সেই স্বপ্নই দেখে উঠলাম। দেখলাম সেই সবুজ ডাটা বেয়ে বেয়ে ওটা সত্যি উঠছে। উঠছেই। যত উঠছে ততো ওটার দুচোখ আরো লোলুপ বীভৎস হয়ে উঠছে। প্রায় ডগা পর্যন্ত উঠতে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর সকালে গুরুর ওখানে যাওয়া পর্যন্ত জেগে জেগেই। কতবার যে ওই স্বপ্নের দৃশ্যটা দেখলাম ঠিক নেই। বাঁকা চোরা আট দশটা লিকলিকে পা বার করে ওটা উঠেই চলেছে।

কিন্তু তা কি কখনো হয়? হতে পারে? এখন আমি নিশ্চিন্ত। ওই লোলুপ বীভৎস রঙিন পোকাটা কোনো দিন আর বারমুডা লিলির নাগাল পাবে না।

কোনদিন না! কখনো না!

রূপসী বাংলার মুখ

মেয়েটাকে চোখের ওপর বড় হতে দেখেছি। ঢলঢলে মিষ্টি মুখ। না কালো না ফর্সা। চোখ দুটো ভারী সুন্দর। না হাসলেও মনে হয় চাউনিতে একটু হাসির মায়া ছুঁয়ে আছে। নামও হাসি। ছ মাস বয়েস হতে ওর মা মনোরমা একদিন মেয়ে কোলে আমার কাছে হাজির। মুখে চিন্তার ছায়া। বলল, আপনার ভাগ্নীর তো ছ মাস হয়ে এলো দাদা, এ-মাসের শেষেই মুখে একই মায়ের প্রসাদ দেব ভাবছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটা নামই ঠিক হল না– আজ আপনার কাছ থেকে ওর একটা নাম না নিয়ে নড়ছি না।

মেয়ের একটা নাম ঠিক করে দেবার তাগিদ এ পর্যন্ত ওর মা আমাকে অনেকবার দিয়েছে। তখন পর্যন্ত বাচ্চাটার বাবা ওকে আদর করে ডাকত বুচু। ওই ডাক শুনে পিত্তি জ্বলে যায় এ-ও মনোরমা নিজেই অনেকবার বলেছে। মেয়ে খাদা নয় বোঁচা নয় তবু বুচু বলে ডাকলে কোন মায়ের ভালো লাগে!...ভাবতে গেলে মনে হয় সেদিনের কথা, মেয়ে কোলে মায়ের আক্ষেপ, পাড়ার সকলেও এখন বুচু বুচু শুরু করেছে, শেষে ও-ই না ডাক-

নাম হয়ে দাঁড়ায়। আপনি এমন একটা নাম দিন দাদা যাতে ভালো নাম ডাক-নাম দুই-ই হয়ে যায়। আমি ওকে বলে দিয়েছি, দাদা নাম ঠিক করে দিলে মেয়েকে আর কোনো নামে ডাকা চলবে না।

ওকে অর্থাৎ ওর স্বামী নয়নকে বলে দিয়েছে। ওরা বসু চৌধুরী। আমি এদের দাদা হলেও আত্মীয়তার কোনো যোগ নেই। লাগোয়া পুরনো দোতলা বাড়িটা ওদের। পৈতৃক ভিটে। দোতলার দুখানা ঘরে ওরা থাকে। জোরে কথা কইলে বা শব্দ করে হাসলে-কাদলে আমাদের বাড়ির ও-মুখো ঘর থেকে শোনা যায়। একতলার ঘর দুটো পুরনো ভাড়াটের দখলে। নামমাত্র ভাড়া পায় বলে অভিযোগ আছে। কিন্তু এতকালে তারাও আত্মীয়ের মতো হয়ে গেছে, তাই মুখ ফুটে কিছু বলে না বা বলতে পারে না। ওপর-নিচের দুই পরিবারই নিজেদের সুখে-দুঃখে আমাদের আপনার জন ভাবে।

পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল, নামের তাগিদে ছ মাসের মেয়ে কোলে মনোরমার। সেই ঘরে এসে চড়াও হওয়াটা স্পষ্ট মনে আছে। যার কোলেই হোক, ঘরে এলেই মেয়েটা আমার টেবিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। লেখার কাগজ কলম বই-পত্র রহস্যজনক খেলার কিছু ভাবে হয়তো। কিন্তু মায়ের কোলে চেপে সেদিন সামনে না ঝুঁকে মুখের দিকে চেয়ে ফিক-ফিক করে হাসছিল। ও-যেন আমার ফ্যাসাদ বুঝেই মজা পাচ্ছে।

মেয়েটার হাসি দেখেই মনে হয়েছিল এই নামটা আমার অনেক আগেই মনে আসা উচিত ছিল। একটুও না ভেবে বলেছিলাম, মেয়ের নাম রাখো হাসি।

অনেকদিনের প্রত্যাশার পরে লেখকের কাছ থেকে এমন সাদামাটা নাম আশা করেনি মুখ দেখেই বোঝা গেল। বলল, শুধু হাসি…

–হাসি আবার শুধু হাসি কি, চোখ বুজে নামটা রেখে ফেলো, ও-নামের কদর পরে বুঝবে।

মেয়েটাও ও-কথার পরেই জোরে হেসে উঠেছিল মনে আছে।

পছন্দ হোক না তোক মনোরমা মেয়ের নাম হাসিই রেখেছে। আর ওর আত্মীয় পরিজন বা চেনা-জানা কাউকেই বোধহয় জানাতে বাকি রাখেনি মেয়ের এই নাম ওমুক দাদা রেখেছে।

তারপর দিনে দিনে মাসে মাসে বছরে বছরে হাসি আমাদের চোখের সামনে বড় হয়েছে। বিকেলে আর ছুটির দিনের দুবেলাই ওদের বাড়ির সামনের কাঁচা উঠোনে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ছোটাছুটি করে, এক্কা-দোক্কা খেলে, লাফাঝাপি করে আর সমবয়সী সব মেয়ের ওপরেই সর্দারি করে। হঠাৎ হঠাৎ মুখ তুলে ওপর দিকে তাকায়। ও ঠিক বুঝতে পারে দোতলার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক সময়েই ওকে আমি লক্ষ্য করি। ঝগড়াঝাটি করা বা সর্দারি করাও লক্ষ্য করি। তখন লজ্জা পায় আর খুব হাসে। সকালে স্কুল-বাসের হর্ন শুনলেই বই-খাতার ব্যাগ বুকে চেপে পড়ি-মরি করে ছুটে আসে, আর তখনো একবার তাকিয়ে দেখে দোতলার রেলিং-এ আমি দাঁড়িয়ে কিনা। ওর দৌলতে বাসের মেয়েরাও ওর মামাবাবুকে অর্থাৎ আমাকে চিনে গেছে, সকৌতুকে তারাও চেয়ে চেয়ে দেখে। কোনো কারণে পর পর দু-তিনদিন আমাকে না দেখলে হঠাৎ এক সময় আমার ঘরে এসে চড়াও হয়। গিনি গিন্নি মুখ।-বা-ব্বাঃ! এত লেখায় ব্যস্ত যে কদিনের মধ্যে দেখাই নেই, আমি ভাবলাম জ্বর-জ্বালা হল নাকি আবার দেখে আসি

সময় সময় আমারও গম্ভীর থাকার চেষ্টা।-জ্বর জ্বরই লাগছে, দ্যাখ তো–

তক্ষুণি কাছে এসে কপালে হাত, বুকে হাত। তার পরেই ঠোঁট উল্টে হাসি। –ধেৎ, পাথরের মতো ঠাণ্ডা গা–তাছাড়া জ্বর জ্বর মনে হলে কেউ পাখার নিচে খালি গায়ে বসে লেখে? আমাকে ঠকাবার মতলব?

–আর তোর পাকামো করতে আসার মতলব?

তক্ষুণি হি-হি হাসি আর ছুট। ভিতরে ভিতরে আমার এই হাসি দেখারই লোভ।

আরো একটু বড় হতে বইয়ের তাগিদ।আজ ওমুক দিদিমণি তোমার একখানা বই চেয়েছে মামাবাবু, সকালে তো মায়ের জ্বালায় আসার সময় পাই না, আজই দিয়ে রাখো।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও গম্ভীর।-বই নেই।

–বা রে, কাল একটা বই না নিয়ে গেলে আমার যে মান-ইজ্জৎ থাকে না।

–কি থাকে না? আবার বলতো?

থতমত খেয়ে হেসে ফেলে। একদিন প্রস্তাব করেছিলাম, আমি ঘড়ি দেখছি, তুই যদি আমার সামনে দাঁড়িয়ে টানা দু মিনিট হাসতে পারিস, তাহলে একটার বদলে দুটো বই পাবি।

শোনামাত্র সে-কি হাসি। হাসির চোটে চোখ মুখ লাল।-তুমি কি যে বলো মামাবাবু, ঘড়ি ধরে কেউ হাসতে পারে, আমি কি পাগল...! আবার হাসি আর ছুট।

এই মেয়ের নাম হাসি ছাড়া আর কিছু হতে পারে! যত দিন যায় নিজেই নিজের বিবেচনার তারিফ করি।

স্কুলের পাট শেষ হবার আগে থেকেই হাসির শাড়ি পরার ঝোঁক। চোখের সামনে মেয়েটা এর ফলে যেন হুট করে এক লাফে বেশ খানিকটা বড় হয়ে গেল। স্বাস্থ্য ভালো, লম্বা গড়ন, শাড়ি পরলে হাসি-খুশি মেয়েটাকে আরো সুন্দর দেখায় অবশ্য। তবু বলেছিলাম দশ ক্লাশ শেষ না হতেই শাড়ি কেন, আরো একটা দুটো বছর ফ্রক ট্রক চালিয়ে গেলেই পারতিস। কলেজের মেয়েরাও আজকাল শাড়ি পরতে চায় না–

হাসির সব কথাতেই হাসি।কত ঢ্যাঙা হয়ে গেছি তোমার চোখ নেই! স্কুলের ঢ্যাঙা মেয়েরা শাড়ি পরে দেখে আমিও ধরে ফেললাম। তুমি আবার মা-কে কিছু। বোলো না বাপু, এমনিতেই বলে আমার দিকে তাকালে তার চোখে এখন কাটা ফোঁটে।

www.bengaliebook.com

মায়ের চোখের খবর ঠিক রাখি না, কিন্তু পাড়ার নতুন বয়সের ছেলেগুলোর চোখের ভাষার কিছু তারতম্য বুঝতে পারি। সময়ে অসময়ে তাদের অনেককেই ও বাড়ির কাছাকাছি ছোঁকছোঁক করে ঘুরে বেড়াতে দেখি। হাসিকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখলে বা বাড়িতে ঢুকতে দেখলে কেউ চকিত হয়, কেউ মুখখানা গম্ভীর করতে চেষ্টা করে, দুঃসাহসী দুই একজন ওকে থামিয়ে কিছু কথাবার্তা কইতেও চেষ্টা করে। হাসির কাছে ছেলেগুলোর এই আচরণ ভারী কৌতুকের ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে তখন আমাকে দাঁড়ানো দেখলে খুব লজ্জা পায়। ওর মুখের এই লজ্জার হাসিটুকু ঠিক ঠিক বর্ণনা করার মতো কলমের জোর নেই। শুধু ভাবি মেয়েটার হাসি নাম সার্থক।

ওদের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার পরে হাসি দিন কতক বাড়িতেই সেঁধিয়ে থাকল। চার নম্বরের জন্য ফার্স্ট ডিভিশন হয়নি। ওর মা এসে জানান দিল, বাড়িতে বলছে লজ্জায় মামাবাবুকে আর মুখই দেখাতে পারবে না। দিন তিনেক না যেতে আবার ওর মায়ের মুখেই এক তাজ্জব খবর। হাসির বিয়ে। গত পরশু বিকেল সাড়ে তিনটেয় ছেলের পক্ষ এসে মেয়ে দেখে গেছে। ছেলের বাবা-মা নেই। বড় দুই দাদা, তাদের দুই বউ আর এক ছোট বোনকে নিয়ে ছেলে নিজেই হাসিকে দেখে গেছে। পছন্দ হয়েছে সেদিনই বোঝা গেছে। আজ সকালে এসে পাকা কথা দিয়ে গেছে। এটা জ্যৈষ্ঠ মাস, এই আষাঢ়েই তাদের ছেলের বিয়ে দেবার ইচ্ছে। মেয়ের মায়ের অর্থাৎ মনোরমার মাথায় এখন ভাবনার আকাশ ভেঙে পড়েছে।

ভাবনার কথা বলল বটে, কিন্তু মুখখানা খুশিতে ডগমগ মনে হল। হঠাৎ এ খবর শুনে আমার মাথায় বরং দুশ্চিন্তা একটু।–সবে স্কুল ফাইনাল পাস করল, এরই মধ্যে বিয়ে…ছেলে কেমন ভালো করে খোঁজ-টোজ নিয়েছ?

-তা আর নিইনি, আমাদের কাছে সোনার টুকরো ছেলে, বি. এসসি পাস, সরকারী চাকরি, রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টে কি একটা পোস্ট-এ আছে বলল, এরই মধ্যে ছশ টাকাব ওপর মাইনে পায়, আর প্রায়ই টুরফুরে যেতে হয়, তাতেও মাসে শ-দেড়শ থাকেই দাবি-দাওয়া বলতে গেলে কিছুই না– ছেলে এখানে বিয়ে করবে বলতেই তার দাদারা উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে

এসেছে–ওর এক জ্যাঠতুতো ভাইয়ের চেনা পরিবার–তারাই সম্বন্ধটা দিয়েছিল, খুব ভালো বলেছে।

জিগ্যেস করলাম ছেলের বয়স কত?

-পঁচিশ। তা হাসিও তো ষোল পেরিয়ে সতেরোয় পা দিতে চলল, এমন কিছু খারাপ হবে না। আপনি যেন ওকে ডেকে একটু উৎসাহ দেবেন দাদা, এমনিতেই সকাল থেকে আমাকে ঝাড়ছে, আপনি খুব খুশি হয়েছেন না বুঝলে ঠিক বিগড়ে যাবে।...এ-দিকের শরীরের অবস্থা তো জানেন, ভালোয় ভালোয় বিয়েটা দিয়ে ফেলতে পারলে একটা বড় দায় শেষ।

শেষেরটুকু যুক্তির কথাই বটে। এই বয়েসেই ওর স্বামী নয়নের ছোটখাট একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে।

সেই বিকেলেই হাসি এলো। হয়তো বা লজ্জাতেই বেঁকে-চুরে সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি সঙ্গে সঙ্গে দারুণ গম্ভীর।–আয়, সেকেন্ড ডিভিশনে সেকেন্ডারি পাস করে আমাকে মুখ দেখাতে পারছিস না, আর তার মধ্যে দিব্যি আর একজনকে মুখ দেখিয়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিলি!

হাসি বলে উঠল, আমার বয়ে গেছে মুৎ ঘোরাতে, একটা ভোদকা

শুনে ধাক্কা খেলাম একটু।–সে কি রে! আমি তো শুনলাম খুব ভালো ছেলে।–তোর পছন্দ হয়নি?

–আমার এখন বিয়েই পছন্দ নয়, হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করলাম না, এরই মধ্যে বিয়ে! তারপরেই দস্তুরমতো মিনতি, তুমি মা-কে ডেকে একটু বলো মামাবাবু, তোমার কথা শুনতে পারে–

বিড়ম্বনায় পড়ে জবাব দিলাম, ভালো ছেলে পেলে সব বাবা-মা-ই মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, চোখ-কান বুজে আপাতত বিয়েটা করে ফ্যাল, আমি বরং তোর বরকে শাসিয়ে দেব, এরপর না পড়ালে বিয়ে নাকচ হয়ে যাবে।

ঠোঁট উল্টে হাসি বলল, আর ছাই পড়া হবে, দেখো–

আষাঢ়েই বিয়ে হয়ে গেল। বর দেখে আমারও যে খুব একটা পছন্দ হয়েছে। তা নয়। ফর্সা, বেঁটে, মোটাসোটা, নাকের নিচে এক ইঞ্চির মতো এক খাবলা গোঁফ। কিন্তু সাধারণ ঘরের বিয়ের বাজারে ছেলের বিদ্যে আর ভালো চাকরিরই কদর। মেয়ে সুখে থাকলে একেই সকলে সোনার ছেলে বলবে।

শ্বশুর বাড়ি যাবার আগে হাসি প্রণাম করতে এলো। সেই প্রথম বোধ করি ওর কাঁদ কাদ মুখ দেখলাম ছদ্ম বকুনির সুরে বললাম, হাসির মুখে কান্না দেখলে। আমার দেওয়া নামের অপবাদ হবে বলে দিলাম! ফিক করে একবার হাস দেখি?

এ-কথার পর হাসিমুখেই প্রণাম করে গেছে।

.

হিসেব না রাখলে সময় পাখা মেলে ওড়ে। দশটা বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে হাসি কত শত বার বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি করেছে তা খেয়াল করার মতো কখনো কিছু ঘটেনি। এই সাতাশ বছর বয়সে হাসি রীতিমতো গিন্নি-বান্নি গোছের হয়ে উঠেছে। এখন এক মেয়ে আর দুই ছেলের মা। মেয়ে বড়ো। ছেলে দুটো ছোট। পড়াশুনা আর হয়নি। বিয়ের এক বছর না ঘুরতে মেয়ের মা হয়ে বসেছে, পড়াশুনা হবে কি করে! এই দশ বছরে খানিকটা মুটিয়েছে, কিন্তু লম্বা বলে খারাপ দেখায় না, উল্টে আরো ফর্সা আর ঢলঢলে মনে হয়। পান খায় খুব, মুখে সেই হাসি লেগেই আছে। দেখা হলেই লাল দুই ঠোঁটের হাসি সমস্ত মুখে ছড়ায়। আমি বলি, পান খাস কেন, অত সুন্দর দাঁতগুলো বিচ্ছিরি হয়ে যাবে।

ও হেসেই বলে, গেলেই হল, কত বার করে দাঁত মাজি জানো!

দাঁতের যত্ন নেয় বোঝা যায়, হাসলে পানের লাল রসে ভেজা দাঁতে সাদার চেকনাই ঝিকঝিক করে। হাসির মুখের হাসি আগের মতোই সুন্দর।

এই দশ বছরের মাথায় একটা অঘটন ঘটে গেল! তৃতীয় বারের হার্ট অ্যাটাকে হাসির বাবা নয়ন মারা গেল। তার পর থেকেই হাসি মেয়ে আর ছেলে দুটোকে নিয়ে বাপের বাড়িতে মায়ের কাছেই থাকে। বড় মেয়ে আর বড় ছেলেটা এ-দিকের স্কুলেই ভর্তি হয়েছে। হাসির মুখেই শুনেছি ছেলে-মেয়ে নিয়ে মায়ের কাছেই থাকবে। ভাসুরদের সঙ্গে এই ব্যবস্থা করে এসেছে। ওর বরের নাম সুবিনয় দত্ত। দশ বছরে ওর চেহারা আরো পরিপুষ্ট আর ভারিক্কি গোছের হয়েছে। তাকে এখন সপ্তাহে দুতিন দিন অন্তত এই শ্বশুর বাড়ির রাস্তায় দেখা যায়। শুনেছি রিহ্যাবিলিটেশনের কাজে প্রায়ই এখন তাকে কলকাতার বাইরে থাকতে হয়। ছেলে-মেয়ে নিয়ে হাসির মায়ের কাছে এসে থাকার এ-ও একটা কারণ। তাছাড়া ও না থাকলে এখন আর মাকে কে দেখবে।

আরো তিন বছর বাদে দ্বিতীয় অঘটন। হাসির মা মনোরমা লিভার ক্যানসারে মারা গেল। বাবার চিকিৎসা বা সেবা হাসি করতে পারেনি। কিন্তু মায়ের জন্য যথাসাধ্য করেছে। বাপের বাড়ির বোল আনার মালিক হবার জন্য মাকে এতটুকু তুচ্ছ করেছে, এ ওর শত্রুও বলতে পারবে না। যদিও বর সুবিনয় এ বাড়ির পাকা বাসিন্দা হবার পর অনেকের চোখ টাটিয়েছে। আড়ালে কেউ কেউ বলেছে, লোকটার ভাগ্য বটে, বিয়ের দৌলতে কলকাতার মতো জায়গায় আস্ত একখানা বাড়ির মালিক হয়ে বসল।

কলকাতায় থাকলে সুবিনয় এখন এ-বাড়িতেই থাকে, এখান থেকে অফিস যাতায়াত করে। তবে দফায় দফায় মাসের প্রায় অর্ধেক দিন বাইরে কাটাতে হয়। হাসির মতো গিন্নি মেয়ের খুব বেশি দিন শোক আঁকড়ে বসে থাকার কথা নয়। সময়ে। আবারও তার পান-খাওয়া ঢলঢলে মুখে সেই পুরনো হাসির ছোঁয়া লাগল। ঘরের বা ছেলেমেয়ের ব্যাপারে কোনো পরামর্শের দরকার হলে সোজা আমার ঘরে চলে আসে। তেমনি হেসে বলে, এলাম আবার জ্বালাতে, রামর্শের দরকার হলে এখন আর তুমি ছাড়া কার কাছেই বা আসব

আমি বলি, কেন সুবিনয় টুরে নাকি?

হাসি ঠোঁট উল্টে দেয়, থাকলেই বা কি না থাকলেই বা কি, ভালো-মন্দ কোনো কিছুর মধ্যে আছে–বিয়ের সময় যা ছিল তার থেকে আরো ভোদকা হয়ে গেছে দেখো না!

সেই রকমই চোখ-জুড়ানো হাসি।

ওর এখন বছর বত্রিশ বয়েস। আর ছেলেপুলে হয়নি। সেজন্য মনে মনে ওরই বুদ্ধি আর বিবেচনার প্রশংসা করি। অনেক দিন আগে এই ছেলেপুলের প্রসঙ্গে ওর মামী অর্থাৎ আমার স্ত্রীকে নাকি বলেছিল, তোমাদের জামাইয়ের স্বভাব চরিত্র যা –ছবছরের মধ্যে তিন-তিনটে চলে আসতে ওই ভালো-মুখো লোককে আর বিশ্বাস। করি! ছোটটা আসার পরেই অপারেশন করিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত।

হাসি হেসে-হেসেই এ-রকম কথা বলতে পারে বটে।

এই হাসির মুখ হঠাৎ থমথমে হয়ে ওঠা থেকেই এই কাহিনী। কিছুদিন ব্যস্ত ছিলাম, তাই লক্ষ্য করিনি। হাসি অনেক দিন আসেনি তা-ও খেয়াল করিনি। সেদিন স্ত্রীর কথায় টনক নড়ল। সে বলল, মেয়েটার কিছু একটা হয়েছে বোধহয়, আসে না, হাসে না, কথা-বার্তাও বলে না–

আমি অবাক।–কার কথা বলছ?

–হাসির। সুবিনয়ের সঙ্গে কিছু একটা হয়েছে, তিন সপ্তাহ হল ওকেও বাড়িতে বসা দেখছি, অফিস-টফিসেও যেতে দেখি না, মুখ চুন করে বাড়ির সামনের দাওয়ায় বসে থাকে–আর এক-একদিন দেখি মেয়েটা আগুনপানা মুখে ফটাফট করে আমাদের দিকের ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, তা-সত্ত্বেও ও-ঘর থেকে ওর গর্জন আর বকাবকি কানে আসে– ডেকে কিছু জিগ্যেস করতে পারি না–এরকম হাসি খুশি মেয়েটার হঠাৎ কি হলো বলো তো?

হাসির মুখে হাসি নেই এ আমার কাছে শুধু বিস্ময় নয়, আঘাতের মতোও। এরপর কদিন লক্ষ্য করেও ওকে দেখতে পাইনি। ওদের এ-বাড়িমুখো

দোতলার ঘরের জানালা দুটো এখন প্রায় সময়ই বন্ধ থাকে। সুবিনয়কেও সত্যি কদিন একতলার দাওয়ায় বসে থাকতে দেখেছি। বিষণ্ণ, বিমর্ষ মুখ। ফর্সা মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। দেখলেই মনে হয় সুখের শরীর-মনের ওপর দিয়ে কিছু একটা ঝড় গেছে।

রাস্তায় হঠাৎ সেদিন মুখোমুখি দেখা। মাথা নিচু করে সুবিনয়ের পাশ কাটানোর চেষ্টা। কিন্তু হাসির জন্যে আমার মনেও কম অশান্তি নয়। ওকে পাশ কাটাতে দিলাম না। জিগ্যেস করলাম, অনেকদিন হাসির দেখা নেই, ভালো আছো তো সব?

সুবিনয় মিনমিন করে জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ..ভালোই।

–তুমি অফিসে যাচ্ছ না দেখছি..ছুটিতে আছ নাকি?

–হ্যা…অনেক ছুটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে…

আর কথার ফুরসত না দিয়ে যেন পালিয়ে বাঁচল। বড় রকমের কিছু গণ্ডগোল বেধেছে তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু সেটা পারিবারিক ব্যাপার না আর কিছু!

মাস দেড়েক বাদে আবার আমার স্ত্রীর মুখেই সমাচার শুনলাম। এর মধ্যে সে আরও অনেকবার জানলা-দরজা বন্ধ ওই মুখোমুখি ঘর থেকে হাসির তর্জন-গর্জন। শুনেছে। সদ্য বর্তমানে হাসিদের একতলার পুরনো ভাড়াটে-গিন্নি ওদের ওপর দারুণ। বিরূপ। হাসি নাকি এতকালের হৃদ্যতা ভূলে ভাড়া ডবল বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে গেছে। ভাড়াটে-গিন্নি আমার স্ত্রীর কাছে এসে নালিশ করেছে, মগের মুলুক ভেবেছে এটা–ভাড়া ডবল বাড়াতে চাইলেই হল–আর যা ব্যাপার এখন, ভাড়া ডবল বাড়ালেই অভাব মিটবে-চরিত্র-দোষে জামাই অমন চাকরিখানা খুইয়ে বসেছে, এখন ভাড়াটের ওপর চড়াও হলে কত আর সুরাহা হবে!

.

এরপর ওদের ভাড়াটে-গিন্নির কথা থেকে বোঝা গেল, পাড়ার মধ্যে আমরাই কেবল প্রতিবেশীর খবর রাখি না, নইলে কেলেঙ্কারির খবর কে আর না জানে! যে টুকু বোঝা গেল তার সারমর্ম, পুনর্বাসন দপ্তরের চাকরি সুবিনয় দত্তর, গরিব ঘরের কত উদ্বাস্তু পরিবারের হর্তাকর্তা বিধাতা ভাবত নিজেকে, কিন্তু ঘুঘু আর কতবার ধান খেয়ে যাবে–একবার ফাঁদে পড়বে না? এক বিধবা মেয়ের সর্বনাশ বলতে গেলে হাতে-নাতে প্রমাণ হয়ে গেছে, শুধু চাকরির ওপর দিয়ে সব নিষ্পত্তি, জেল হয়ে যায়নি এই রক্ষে। সোয়ামির সঙ্গে মেয়ের দিন-রাত কুরুক্ষেত্র চলেছে এখন, মেয়ের গলার চোটে এক-তলায় কান-পাতা দায়, দুবেলা হিসহিস করে স্বামীকে শাসাচ্ছে, অমন লম্পটের জেলে পচে মরাই উচিত ছিল, তাহলে তার হাড়ে বাতাস লাগত। মেয়েও বলিহারি! দুবেলা মাথা খোঁড়ে আর বিধবা হতে চায়! বাইরে এ-দিকে ঢাক ঢাক গুড়গুড়–কিন্তু সত্যি কথা কদিন আর জানতে বাকি থাকে!

বুঝলাম, পাড়ায় এই সত্যি-কথা রাষ্ট্র করার গুরু দায়িত্ব ওদের ভাড়াটে-গিন্নিই। নিয়েছে।

আমার হাড়-পাঁজরে একটা বোবা যন্না ছড়িয়ে পড়ছিল। মেয়েটাকে আমি কত ভালবাসি তা যেন এতদিন জানতাম না। কেবল আশা করছি, বিনা দোষেও তো। অনেকে অনেক সময় বিপাকে পড়ে–এ কি সেরকম কিছু হতে পারে না? রাগে দুঃখে মাথার ঠিক নেই বলেই হাসি হয়তো সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সুবিনয়ের সর্বদা অপরাধী মুখ দেখে এ আশাও ফিকে হয়ে আসছিল।

পরের একটা বছরে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। হাসির মুখে হাসি তো নেই-ই। ওদের সংসারে অনটনের ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুনেছি, সুবিনয়ের চাকরিই শুধু যায়নি, হাতে শুধু নিজের-দেওয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কটাই পেয়েছে। এ ছাড়া সতের বছরের চাকরির পেনশন গ্র্যাচুইটি সবই মার গেছে। মেয়ে আর ছেলে। দুটো নামকরা স্কুলে পড়ত, স্কুল বাসে যাতায়াত করত। ক্লাস-প্রমোশন হয়ে যেতে তারা কাছাকাছির এমন স্কুলে ভর্তি হয়েছে যেখানে স্বল্পবিত্তের মানুষও পারতে ছেলে মেয়ে

দিতে চায় না। ওই ছেলে-মেয়ের মুখের হাসিতেও টান ধরেছে। হাসিকে থলে হাতে ইদানীং ক্বচিৎ কখনো কাছের বাজারে যেতে বা আসতে দেখি। কিন্তু এ-বাড়ির দোতলার দিকে ছেড়ে মুখ তুলে কোনদিকেই ওকে তাকাতে দেখি না। শুকনো টান ধরা মুখ। পুজো এলো গেল, কিন্তু এবারে ও বিজয়ার প্রণাম করতেও এলো না। ডাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সংকোচ হয়, ডাকতে পারি না। আমার স্ত্রীও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, অত হাসি-খুশি মেয়েটা কি হয়ে গেল!

এক বছর বাদে। সকালে অন্যদিনের মতোই কাজে বসেছিলাম। মুখ তুলে আমিই সচকিত হঠাৎ। হাসি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

ভিতরে আসব মামাবাবু?

আমিও গম্ভীর একটু।–আয়। কবে আবার জিগ্যেস করে এ-ঘরে ঢুকেছিস? বোস–

হাসতে চেষ্টা করল। এ হাসি কান্নার মতোই। একটা মোড়া টেনে বসল। বলল, মুখ কেন দেখাতে পারি না জানোই তো...

আমি কিছুই জানি না, জানতে চেষ্টাও করি না। বিনা দোষেও অনেকের ওপরে অনেক অবিচার হয়। কিন্তু যত দুঃখের ব্যাপারই হোক, তুই আমাকে সুষ্ঠু হেঁটে দিলি?

চুপচাপ চেয়ে রইল একটু।–আমার সব গুমর ভেঙে গেছে মামাবাবু, দিন আর চলছেই না, তাই না এসে পারলাম না....যা হোক কিছু ব্যবস্থা করতে পারো?

হাসির মতো মেয়ের হার-না-মানা মুখের থেকে হার-মানা মুখ দেখলে বেশি কষ্ট হয়। আমি কি করতে পারি না বুঝে জিগ্যেস করলাম, কি ব্যবস্থার কথা। বলছিস?

দেখলাম, সহানুভূতি সত্ত্বেও আমার মাথায় যা আসেনি, বিপাকে পড়ে হাসি তা ভাবতে পেরেছে। মাথা নীচু করে সাদা কথায় বলল, আমার বেয়াই বা

জামাইকে বলে যদি সুবিনয়ের কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে পারি। একবার মুখ তুলে আমার প্রতিক্রিয়া দেখে আবার মাথা নীচু করল-লোকটা যেমনই হোক, কাজে-কর্মে খুব সুনাম ছিল মামাবাবু...।

আমার বেয়াই আর জামাইয়ের মস্ত কন্ট্রাকটারি ফার্ম। কনস্ট্রাকশন আর ডেভেলপমেন্ট দুরকম কাজেই তাদের বহু লোক খাটছে। কিন্তু সেখানে কারো কাজের সুপারিশ এ-পর্যন্ত করিনি। তবু আমিও যেন একটা পথ দেখতে পেলাম। কারণ। বেয়াইয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার থেকেও হৃদ্যতার দিকটা ঢের বড়। ভদ্রলোক বাইরে মেজাজী রাশভারী মানুষ, কিন্তু ভিতরে যেমন উদার তেমনি দিলদরিয়া।

পরে জানাবো বলে হাসিকে তখনকার মতো যেতে বললাম। বেয়াই বেশি শুনতে চাইলেন না। আমি অনুরোধ করছি সেটাই যথেষ্ট ধরে নিয়ে সুবিনয় দত্তকে তার কাছে। পাঠিয়ে দিতে বললেন।

চাকরি হল। রিহ্যাবিলিটেশনে কাজ করেছে জেনে ছেলের অর্থাৎ আমার জামাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে ডেভেলপমেন্টের কাজে দিলেন। মাইনে সর্বসাকুল্যে ছশ। দিন-কাল যা ছশ টাকা কিছুই না। কিন্তু হাসি তাতেই হাতে স্বর্গ পেল। আমি বললাম, মন দিয়ে কাজ করতে বল, এরা গুণের কদর করতে জানে।

হাসি হেসে জবাব দিল, সেটা আমি তাকে খুব ভালো করে সমঝে দিয়েছি–অনেক বার বলেছি, বেয়াইয়ের কাছে কক্ষনো তোমার জন্যে মামাবাবুর মুখ ছোট হলে রক্ষে থাকবে না।

এত দিন বাদে ওকে ওইটুকু হাসতে দেখেও মনে হল, সময়ে ও আবারও আগের। মতোই হাসতে পারবে। মুখেও বললাম, আমার মুখ নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না, আমি কেবল তোর মুখে হাসি দেখতে চাই।

ছলছল চোখে হাসি পায়ের ধুলো নিল। বলল, আশীর্বাদ করো মামাবাবু, তোমার দেওয়া নাম আর যেন কালো না হয়।

হয়নি। ছমাস না যেতে বেয়াইয়ের মুখে সুবিনয়ের প্রশংসা। খাসা লোক দিয়েছেন মশাই, চেহারা দেখলে বোঝা যায় না এত খাটতে পারে, তাছাড়া সারভের কাজে বেশ পাকা, ডেভেলপমেন্টের কাজেও ভালো মাথা–কেউ শত্রুতা না করলে এ-রকম লোকের চাকরি যায় কি করে।

চাকরি কি করে যায় সে-আলোচনায় আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। বেয়াই যে খবরটা নিজে আমাকে বলেননি, হাসিমুখে এসে সে-খবর আমাকে হাসি দিল। এই ছমাস যেতেই সুবিনয়ের মাইনে আরো একশ টাকা বেড়েছে– আর পাকা খাতায় তার নাম উঠেছে, অর্থাৎ এরপর চাকরির শেষে প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটিও পাবে।

.

পরের তিন বছরের সমাচারে নিরানন্দের ছিটে ফোঁটাও নেই। হাসির বয়েস এখন ছত্তিরিশ, তার মেয়ে সুমিতার আঠারো। মেয়ের চেহারা মোটামুটি। এ-বয়সে তার মা যা ছিল তার ধারে কাছেও নয়। এবারে হায়ার সেকেনডারি দেবে। মেয়ের বিয়ের ভাবনা-টাবনা হাসির মাথায় নেই। অনেক দিনই বলেছে, লেখাপড়ায় ভালোই, যতটা পড়তে চায় পড়ুক, তারপর বিয়ে। আঠারো বছরের মেয়ের মুখের হাসির থেকে এখনো ছত্তিরিশ বছরের মায়ের হাসি আমার চোখে ঢের বেশি সুন্দর।

বছরখানেক হল সুবিনয়কে বাঁকুড়ায় থাকতে হচ্ছে। বাঁকুড়ার অনেকটা ভিতরে মেজিয়া। সেখানে থারমল পাওয়ার স্টেশন হবে। সেইজন্যে আশপাশের বিরাট এলাকা। জুড়ে মাটি কাটা আর জমি ভরাটের কাজ চলছে। এসব জায়গায় নতুন টাউনশিপ গড়ে উঠবে। এই মাটি কাটা আর জমি ভরাটের বিশাল কন্ট্রাক্ট আমার বেয়াই পেয়েছেন। এই তিন বছরের মধ্যেই নিজের যোগ্যতায় সুবিনয় আরো অনেক ওপরে উঠেছে। Tই গত বছর তাকেই ম্যানেজার অর্থাৎ এ-কাজের সর্বেসর্বা করে পাঠিয়েছেন। এখন তার মাইনে বারো শ টাকার ওপরে। দুশর মতো কুলি-মজুর কামিন খাটায়, তার অধীনে দুজন সহকারী ম্যানেজার, জনা দুই সারভেয়ার, জনাকতক সুপারভাইজার আর ট্রাক, ড্রাইভিং ইউনিট কাজ করছে। এরা

সকলেই সাইট-এর টেন্ট-এ থাকে। সুবিনয় গ্রামের ধারে ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। তার এখন আলাদা মর্যাদা। তবে সক্কলেরই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা টেন্ট ক্যানটিনে। আমার বেয়াই ভদ্রলোক নিজে ভোজন-রসিক, কর্মচারীদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও তার ফার্মের উদার নীতি। বেশ বড় আকারের এক ক্যানটিন ইউনিটও সেখানে বহাল।

কলকাতা থেকে মেজিয়া মোটরে বা জীপে সাত ঘণ্টার মতো পথ। বেয়াই তার নিজস্ব জোঙ্গায় (জীপের মতোই, আকারে বড়) মাসে দুই একবার সেখানে ইনসপেকশনে যান। আর ছেলে অর্থাৎ আমার জামাই এখানে ফার্মের অন্য কাজে ব্যস্ত, তাই ফি সপ্তাহে দেখে শুনে আসার জন্য অন্য ইনসপেক্টর আর এঞ্জিনিয়ার পাঠাতে হয়। সুবিনয় দুতিন মাসে দুই একদিনের জন্য কলকাতায় আসে, কাজের চাপে তার বেশি আসা সম্ভবও নয়।

তকতকে নীল আকাশ থেকে বজ্রপাত কি সত্যি কখনো হয়? সেদিন বিকেলে বেয়াইয়ের টেলিফোন পেয়ে অন্তত আমার মনে কোনরকম আশংকার ছায়াও পড়েনি। চিরাচরিত হাসি-ছোঁয়া ভারী গলা। বললেন, অনেক দিন বসা হয়নি, সন্ধ্যার দিকে একবার আসুন না, একটা ভালো জিনিস খুলব…তাছাড়া একটু আলোচনাও আছে।

এ-রকম আমন্ত্রণ নতুন কিছু নয়। ভালো জিনিসের লোভ দেখানোর অর্থ বিলিতি বোতল। আনুষঙ্গিক খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ভালোই থাকে। ভদ্রলোকের বড় কোনো কাজের ধকল শেষ হলে এই গোছের আমন্ত্রণ আসে। এ-বয়সেও ওই এক জিনিসে আমারও একটু-আধটু লোভ আছেই।

খুশি মনেই গেলাম। তখনও ভদ্রলোকের হাসিমুখে এতটুকু দুর্যোগের আভাস পাইনি। সকলে মিলে খানিক গল্পগুজব চলল। বৈবাহিকা আর মেয়ে খাবার আর অন্যান্য সরঞ্জাম সাজিয়ে দেবার পর ভদ্রলোক বললেন, এখন আমাদের একটু দরকারি আলোচনা, আছে

আমার মেয়েকে নিয়ে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা দুটো টেনে। দিলেন। আমি উৎসুক একটু, কি ব্যাপার?

–এমন কিছু নয়, ভদ্রলোকের হাসি মুখ, আগে শুরু তো করুন–

প্রথম দফায় ওই ড্রিংক আর ফুড নিয়েই হালকা কথা-বার্তা। দ্বিতীয় দফার শুরুতে হাসিমুখেই ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সবিনয় দত্তর চাকরিটা যে গেছল সে-কি কোনো মেয়ে-টেয়ের সঙ্গে কিছু অ্যাফেয়ারের ব্যাপারে?

আমি এত চমকে উঠলাম যে হাতের গেলাস থেকে খানিকটা ড্রিংক চলকে জামায় পড়ল। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত একটু, পাশ থেকে ছোট তোয়ালেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, কি কাণ্ড, এ-রকম ধাক্কা খাবার মতো কিছু ব্যাপার নয়–

ভদ্রলোকের স্নায়ু আমার থেকে দশগুণ শক্ত এ অনেক দিন জানি। তাই আশ্বস্ত হওয়া গেল না। জামাটা মুছে সোজা তাকালাম, বললাম, চাকরি ওই রকম কিছু ব্যাপারেই গেছল শুনেছি…কি হয়েছে আমাকে খোলাখুলি বলুন।

-বলছি। খান…।

খাওয়া মাথায় উঠেছে। কিন্তু ভদ্রলোকের কাছে ব্যস্ততা দেখিয়ে লাভ নেই। এরপর খেতে খেতে ধীরে সুস্থে যে সমাচার শোনালেন, ভিতরে ভিতরে আমি নিস্পন্দ কাঠ।

….মেজিয়ার একটা নিচু শ্রেণীর মেয়েকে নিয়েই ব্যাপার এবারও। বছর উনিশ হবে বয়েস। যারা দেখেছে তারা বলে খুব কালো হলেও ওদের মধ্যে অন্তত চোখে পড়ার মতো মেয়ে। ওদের শ্রেণীর একটা ছেলের সঙ্গে বিয়েও নাকি ঠিক হয়ে আছে, কিন্তু মেয়ের মা মোটা রকম পণ হাঁকতে ছেলেটা দেড় বছর ধরে টাকা জমানোর চেষ্টায় আছে। এর মধ্যে ওই মেয়েটাকে সুবিনয় টাকা গয়নার টোপ ফেলে বশ করেছে। ব্যাপারটা এখন ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। তিন-চার মাস যাবৎ বেয়াই এ নিয়ে কিছু কানা-ঘুষা শুনছেন। কিন্তু যে লোক অত ভাল কাজ করে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে

তিনি মাথা ঘামানো দরকার মনে করেন নি। এখন না ঘামিয়ে পারছেন না। ম্যানেজার সুবিনয় দত্তর নামে কয়েকটা বে-নামী চিঠি পেয়েছেন–তার ধারণা, ওর আন্ডারের যে-সব লোক সাহস করে মুখে কিছু বলতে পারছে না, হিংসেয় হোক বা রাগে হোক তাদেরই কেউ কেউ এ-সব চিঠি পাঠাচ্ছে। বেয়াই তাতেও গা করতেন না, কিন্তু এখন লেবারের মধ্যেও এ নিয়ে অশান্তি দেখা দিচ্ছে, যে-ছেলেটার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে হবার কথা সেই এখন লেবারদের ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টায় আছে। ভালো করে খোঁজ-খবর নেবার জন্য বেয়াই এ-সপ্তাহে একজন বয়স্ক ইনসপেক্টরকে পাঠিয়েছিলেন। সে-ও এসে দুশ্চিন্তার কথাই বলেছে। মেয়েটার নাম দুলালী। সুবিনয় এখন নিজের বাড়িতেই এনে রেখেছে। খাবার সময় সাইটের ক্যানটিনে সে এখন-খেতে পর্যন্ত আসে না। ক্যানটিন থেকে ওদের দুজনের খাবার তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। এ-সব এখন অনেকেই বরদাস্ত করতে পারছে না। বক্তব্য শেষ করে ঈষৎ আশ্বাসের সুরে বেয়াই বললেন, সামনের শনিবারে কাউকে কিছু না জানিয়ে ওই ইনসপেক্টরকে নিয়ে আমি নিজে যাব, লেবার ক্লাসের মধ্যে গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখলে আমাকে স্টেপ নিতেই হবে…তা না হলে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই-আমার ইচ্ছে শনিবার আপনিও আমার সঙ্গে চলুন।

মাথায় আগুন জ্বলছে। ব্লাড প্রেসারও চড়ে গেছে বোধহয়। বললাম, আমার যাবার দরকার নেই, আপনি সিভিয়ার স্টেপ নিন।

ওঠার আগে ভদ্রলোক বার বার বললেন, আপনার আজকের আনন্দটাই মাটি করে দিলাম দেখছি।

বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে একটি কথাও বললাম না। ভেতরে অশান্তির ঝড়। আবার মেয়ে আর ছেলে দুটোর শুকনো মুখ চোখে ভাসছে। হাসির কালো মুখ চোখে ভাসছে। এমন অশান্তিতে জীবনে কখনো পড়িনি। রাতে ঘুম হলই না। হাসি আর ওর মেয়ে আর ছেলে দুটোর কথা ভেবে আমার মনের জোর কমে গেছে। সকালে উঠে ফোনে বেয়াইকে জানালাম, শনিবারে আমি তার সঙ্গে মেজিয়ায় যাচ্ছি।

মনের তলায় ক্ষীণ আশা, ওই সুবিনয়কে শায়েস্তা করার জন্য পায়ের থেকে জুতো খুলে মেরেও যদি ওর চাকরিটা বজায় রাখার সুযোগ মেলে তো তাই করব –তবু চাই না এতবড় অশান্তির খবর হাসি বা তার সংসারের কেউ জানুক।

গরম কাল। সকাল ছটায় রওনা হয়ে সাড়ে বারোটায় বেয়াইয়ের সঙ্গে তার জোঙ্গায় চেপে মেজিয়ায় পৌঁছেছি। সঙ্গে সেই বয়স্ক ইনসপেক্টর আর আরো একজন। লোক। খুব সকালে বেরুনোর ফলে এরই মধ্যে দুর্গাপুরে সকলে দুপুরের খাওয়াও সেরে নিতে পেরেছি।

মেজিয়ায় পৌঁছে আর সাইটে এসে বেয়াইকেও হতভম্ব দেখলাম একটু। সেখানে সুবিনয় নেই। ভয়ে ভয়ে একজন কর্মচারী জানালো, সে তার বাড়িতেও নেই, সকাল। থেকেই বাড়ি তালা-বন্ধ। আরো খোঁজ নিতে জানা গেল গত রাতে পর্যন্ত সেই মেয়েটা অর্থাৎ দুলালও তার বাড়িতে ছিল। সকালের মধ্যে দুজনেই কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

মেজিয়া থেকে হামেশাই কেউ না কেউ কলকাতার অফিসে যাতায়ত করে। গত কদিনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সাহেব আজ আসছে আর কি জন্যে আসছে সে খবর সুবিনয় কোনোভাবে জেনেছে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। তাই মেয়েটাকে সুষ্ঠু নিয়ে কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে।

ঘণ্টা তিনেক থেকেও সেখানকার লেবার ক্লাসকে ম্যানেজারের ওপর ক্ষুব্ধ মনে। হল না আমাদের। যার সঙ্গে দুলালীর বিয়ে হবার কথা সে এখানকার শ্রমিকদের কেউ নয়, কাজেই তার দেখা পাইনি। কিন্তু এখানকার শ্রমিকদের সে ক্ষেপিয়ে তুলছে এমন আভাসও পেলাম না। ম্যানেজারের ওপর ভদ্রলোক কর্মচারীরাই কেবল বিরূপ। ব্যাপারটা সম্ভবত তারাই বরদাস্ত করতে রাজি নয়। সাহস পেয়ে তারা অনেকেই বলেছে ম্যানেজার। সুবিনয় দত্তকে এখান থেকে না সরালে তাদের মান থাকে না।

ফেরার সময় দুটি ছেলে কলকাতায় ফিরবে বলে আমাদের জোঙ্গায় উঠেছে। সামনে ড্রাইভারের পাশে আমি আর বেয়াই। বেয়াইয়ের মুখ এখন

থমথমে। চাপা রাগে বললেন, আমি আসছি জেনে এভাবে পালানোর জন্যেই তাকে স্যাক করব।

আমি নির্বাক। সামান্য মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তাই করা উচিত। নিজের মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকে নিয়ে এই কুৎসিত ব্যাপার সহ্য করব কি করে? ভয়ে পালিয়েছে সে-অপরাধ আমি অত বড় করে দেখছি না।

হঠাৎ সচকিত আমরা। পিছনের ছেলে দুটোর একজন বলে উঠল, ওই দুলালীর মা দাঁড়িয়ে।

মালিকের ইশারায় ড্রাইভার গাড়ির ব্রেক কষল। জংলা রাস্তার ধারে পঁচিশ ত্রিশ গজের মধ্যে বিবর্ণ খাটো শাড়ি-পরা এক রমণী দাঁড়িয়ে। হাড়ের ওপর কালো চামড়া মোড়া। চোখ দুটো গর্তে। চোয়ালের দুদিকের হাড় উঁচিয়ে আছে। রুক্ষ চুলগুলো তেলজলের মুখ দেখে না।

আমাদের দিকে, না ঠিক আমাদের দিকে নয়, সে মালিক চেনে মনে হল বেয়াইয়ের দিকে এমন চেয়ে আছে যেন চোখের আগুনেই তাকে ভস্ম করে ফেলবে। চোখ দুটো সত্যি জ্বলছে। এমন ক্রুদ্ধ হিংস্র ভয়ংকর মূর্তি জীবনে দেখেছি কিনা জানিনা। পারলে সে গাড়িটার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। ...

তবু, যে লোকের জন্য তার মেয়ের এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেছে, সেই লোকের মনিবের ওপর এই রাগ অস্বাভাবিক মনে হল না।

সামনে এসে বেয়াই নামলেন। ভয়ে ভয়ে পিছনে আমিও। নিকষ কালো এই অগ্নিমূর্তির মেয়েলোকটা দিশেহারা রাগে ভদ্রলোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

তার সামনে এসে ভারী অথচ সদয় গলায় বেয়াই জিগ্যেস করলেন, তুমি দুলালীর?

তক্ষুণি জবাব না দিয়ে মেয়েলোকটা জ্বলন্ত চোখে আমাদের দুজনকেই তার এক দফা ভস্ম করে নিল। তারপর হিসহিস গলায় তরল আগুনের ঝাঁপটা মাল। –ক্যানে, মোর পরিচয়ে তোমাদের কি দরকার বটটে?

ঠাণ্ডা গলায় বেয়াই বললেন, দরকার কিছু নেই।...আমরাও ওই ম্যানেজারের বির করতেই এসেছিলাম, কিন্তু দেখা পেলাম না, আপাতত পালিয়েছে। সঙ্গে তোমার মেয়েও। ...ম্যানেজারের ব্যবস্থা হবে, কিন্তু তোমারও মেয়েকে একটু সামলে রাখা উচিত ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে শুকনো বারুদে আগুন ধরানো সম্পূর্ণ হল। হাত, মুখ নেড়ে চারব না হয়ে ফেটে পড়ল।–তোমরা ওই মানিজারের বিচার করবেক, তাকে শাস্তি দিকে? ক্যানে তোমাদের এত হিংসা বটটে? ক্যানে শিকারীর মতো তোমরা ওই ভালো মানুষ মানিজারকে খুঁজতে লেগেছ? আমার মেয়েটা এট্ট ভালো খেতে পেলেক, পরার ভালো কখানি শাড়ি পেলেক, কানে হাতে পায়ে রূপার গয়না পেলেক-মুইও এটু সুখের মুখ দেখতে পালাম-তোমাদের তা সহ্যি হল না ক্যানে? তোমরা এততো নিষ্ঠুর ক্যানে? ক্যানে ক্যানে ক্যানে?

আমরা দুজনেই স্তব্ধ, নির্বাক, বিমূঢ়!

জোঙ্গা ছুটেছে। আমরা আবার পাশাপাশি বসে। অনেকক্ষণ বাদে বেয়াই খ খুললেন। তার ঠোঁটে হাসির আঁচড়। ভারী গলা যতটা সম্ভব মৃদু করে বললেন, কে কাকে ফাঁদে ফেলেছে মশাই?...এরপর বিচারটা কি-রকম হবে?

বিড়বিড় করে জবাব দিলাম, জানি না।

জোঙ্গা ছুটেছে। আমার চোখের সামনে হাসির মুখ, তার মেয়ে সুমিতার মুখ, তার ভাই দুটোর মুখ ভাসছে। রাস্তার দুদিকে আর কাছে-দূরে শাল পিয়াশাল জিয়াল পলাশ মহুয়া বহেরার গাছ। সামনে তকতকে নীল আকাশ। সব কিছু ছাপিয়ে চোখের সামনে বড় হয়ে উঠছে নিকষ কালো এক রমণীর ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত জ্বলন্ত ক্ষুধার্ত মুখ।

www.bengaliebook.com